দরজার সম্মুখে থামিল। বরকন্দাজদের অগ্রসর হইবার আদেশ দিয়া গিরিশ রায় পাল্কী হইতে নামিলেন। বিশাল হেম-গিরির মত আকৃতি! বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ লইয়া উন্নত-শিরে ধীর-পাদবিক্ষেপে যখন তিনি দেউড়ীতে দরোয়ানদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন, সেই পরিচিত তেজোব্যঞ্জক-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। পাইকদের অধিকাংশ সকালেই গোয়াড়ী চলিয়া গিয়াছে। কারণ, তাহারা যে আজ সাক্ষী। যাহারা ছিল তাহারা অনায়াসেই সে-দিনের অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিত, কিন্তু সে কথাও তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। কেবল দুইজন অল্পবয়স্ক নূতন ভোজপুরী, যাহারা একমাস পূর্ব্বে গঙ্গার রক্তসিক্ত সৈকত হইতে সকলের অগ্রে আসিয়া চৌধুরীবাড়ীতে সংবাদ দিয়াছিল যে, রায়েদের লেঠেলে চর অধিকার করিয়া লইয়াছে, তাহারাই কেবল রোষ-কষায়িত লোচনে সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। গিরিশ রায় যাইবার সময় একটি বার মাত্র তাহাদের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন আর মন্ত্রশান্ত সর্পের মত তাহাদের ক্রুদ্ধদৃষ্টি নম্র হইয়া গেল। যখন তাঁহার দীর্ঘদেহ দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইল, তখন একজন ভোজপুরী বলিল, "সেদিন ঐ লোকের জন্যই বাপের ডাইন হাত ও শিরে চোট্ লাগিয়াছিল, আমার ইচ্ছা হইতে—।" বাধা দিয়া বৃদ্ধ দরোয়ান লালসিং বলিল, "যা ইচ্ছা হইয়াছিল তা' সেদিনই করিলে পারিতে। আজ বাবু গিন্নী-মাকে প্রণাম করিতে যাইতেছে, বাড়ীর ভিতর আপনি আসিয়াছে, আজ ওসব কথা ভাবিস্ নে খবরদার।

অন্দরে প্রবেশ করিয়া গিরিশবাবু ডাকিলেন, 'খুড়িমা! খুড়িমা কোথায়! বিরাট কণ্ঠের সে মেঘ-গম্ভীর স্বর শুনিয়া বউ-ঝিরা সরিয়া গেল। চৌধুরী-গৃহিণী তাড়াতাড়ি দালানে আসিলেন। গিরিশ রায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন;—উঠিয়া বলিলেন, 'খুড়িমা, আজ পঞ্চমী, তোমার কি তা' মনে নাই? তুমি আমাকে ডাক নাই, আজ আমি না খাইয়া গোয়াড়ী যাইতেছি।' মর্ম্মের বড় কোমল স্থানে কথাটা গিয়া বাজিল। গিরিশের মাতার মৃত্যুর পর তাহাকে প্রথমে তিনিই স্তনদুগ্ধ পান করান। বাল্যকালে তাহার কতদিন চৌধুরী-বাড়ীতে কাটিয়া গিয়াছে। তারপর পঞ্চমীর দিনগুলিতে তাহাকে সযত্নে আহার করাইয়া চৌধুরী গৃহিণী যে আরাম ও তৃপ্তি উপভোগ করিতেন, তাহা মনে পড়িল। আরও স্মরণ হইল, এই রুদ্র-মূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত ব্রাহ্মণ তখন শান্ত শিষ্ট শিশুর মত কিরূপ নিরীহ-ভাবে সাংসারিক কথা আলোচনা করিত। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গিরিশ পঞ্চমীর দিন কয়টা তাঁহার নিকটে আহার করিয়াছেন। আজ তাঁহাকে বলা হয় নাই। জমীদারে জমীদারে লাটালাঠি—মকদ্দমা, সে ত হইয়াই থাকে—তাহাতে মা-ছেলের সম্পর্ক কি টুটিয়া যায়? প্রবীণা রমণী বালিকার মত অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন — তারপর আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, 'বাবা গিরিশ, আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি এবার আসিবে না; যখন মনে করে খুড়িমার কাছে এসেছ, দু'টি ভাত মুখে দিয়া যাও। এখনি কর্ত্তা খাইয়া গিয়াছেন, দেরী হ'বে না, সব তৈরী আছে।'

আহার শেষ হইল। আচমন-হস্ত

প্রক্ষালনের পর, চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে খুড়িমার চরণে গিরিশবাবু পুনরায় ভূলিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। চৌধুরী-গৃহিণী বাস্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন 'বাবা গিরিশ, আশীর্ব্বাদ করি যেন জয়ী হইয়া ফিরিও। আমি যদি সতী হই, তুমি জয়ী হইয়া ফিরিবে।

সতীর কথা মিথ্যা হয় নাই। গিরিশবাবু জয়ী হইয়া ফিরিলেন। বৃদ্ধ চৌধুরী আদালত হইতে বাহির হইবার সময় বলিলেন, "বুড়াকে দু'বার হারালি—চরে হার আবার আদালতে হার"। গিরিশ রায় বলিলেন, "খুড়িমার আশীর্ব্বাদ! এ রকম * * * * ব্যাপারে ছেলেরই জিত হইয়া থাকে"।

সে লালসিং ভোলাসিংএর দল চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছে; সে চৌধুরীবাড়ী আর নাই। যে কটক দিয়া গিরিশ রায় অভিমান-ভরা ক্ষুব্ধচিত্তে অন্দর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা সে বৎসরের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল সেই অষ্টভুজার মন্দির, যাহা গিরিশ রায় মাতৃ-স্বরূপা চৌধুরী-গৃহিণীর নামে মহাসমারোহে স্থাপন করিয়াছিলেন; আর আছে সেই বিশাল জাহ্নবী-চর যাহার বালুকাময় হৃদয় আজ শ্যামবৃক্ষ-শ্রেণী ও অট্টালিকায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সে দিনকার চর আজ একটী গণ্ড গ্রাম—আর তাহার উপসত্বে মন্দিরের সেবা ও কার্য্য চলিয়া যাইতেছে;—কারণ, সে ত' গিরিশ রায়ের কৃত দেবোত্তর।

শ্মশানে সধবা।

মৃত্যু-২৩শে চৈত্র ১৩২৭। দিবা দ্বিপ্রহর, শুভ বারুণী যোগ।

কে তুমি শ্মশানে আজ এয়োস্ত্রী রমণী,
হিন্দু-কুল-গৃহলক্ষ্মি পুণ্যবতি নারি?
সীমন্তে সিন্দূর-ছটা, অলক্ত-রঞ্জিত
চরণ-দু'খানি তব; গলে পুষ্পমালা;—
কুসুম বিস্তৃত হেরি চারি পাশে তব;—
সাজিয়াছ কি সুন্দর কুসুমের রাণী!
পরিয়া নূতন বস্ত্র হাসি হাসি মুখ,—
সতীর কিরণ-জ্যোতিঃ শোভিছে বদনে!—
কত সাধু হেথা আজ এ শ্মশান-ভূমে
লইতেছে পদরজঃ তোমার আনন্দে;
ডাকিতেছে 'মা মা' বলি তোমা উচ্চস্বরে;
কেহ বা পূজিছে তোমা অতিসমাদরে!
হেরিয়া স্মৃতির পটে গুণগ্রাম তব,
ওই যে আত্মীয় কত বিষাদ-অন্তরে
ফেলিছে শোকাশ্রু আজ বিনত-বদন!—
তোমার বিয়োগ হৃদি ব্যথিছে তাদের!
ধন্য তুমি এয়োরাণী সধবা রমণী!
তোমার পরশে ধন্য এ শ্মশান-ভূমি!
তোমার বাঞ্ছিত সদা হরিনাম আজ
গাহিছে বৈষ্ণববৃন্দ মনের হরষে!
কে তুমি, কহ গো দেবি, এসেছিলে হেথা!
এই নিম্ন নরলোকে কিছু দিন তরে—
খেলিয়া সাধের খেলা খেলাঘর পাতি,
পুত্র পৌত্র সবে রাখি স্বামীর সহিত,
আবার চলিলে কি সে অনন্ত আবাসে?
ছিন্ন করি মায়া-রজ্জু সংসার-বন্ধন,
সগৌরবে চলি গেলা ফেলিয়া সবায়।
ধন্য তুমি পুণ্যবতী এয়োস্ত্রী রমণী!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পুস্তক-সমালোচনা।

১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা" আমরা আদ্যন্ত অতি আগ্রহ-সহকারে পাঠ করিয়াছি। এইরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল। আমেরিকা এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য সভ্যদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তক দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে, শিক্ষাবিষয়ক সাময়িক পত্রের অহরহঃ এত আবির্ভাব হইতেছে যে,শিক্ষালোচনা ইতোমধ্যেই সাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা-সাহিত্যে শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থের বড়ই অভাব। এই অভাব দূর করিতে প্রয়াস পাইয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ক্ষিতীন্দ্রবাবুর শিক্ষালোচনার মূলসূত্রগুলির সম্বন্ধে আমাদের কোন মতভেদ নাই। শৈশবশিক্ষা, বাল্যশিক্ষা, যৌবনশিক্ষা, প্রৌঢ়-শিক্ষা, প্রত্যেক অবস্থাতেই শারীরিক ব্যায়াম অতীব প্রয়োজনীয়। জাপান ও আমেরিকায় শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই শারীরিক ব্যায়াম অবশ্য-গ্রহণীয়। আমাদের দেশেও বহু পূর্ব্বেই ইহার প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত ছিল। তাহার পর, ধর্ম্মশিক্ষা। জাপানে ধর্ম্মশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রতিবিদ্যালয়েই নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া নীতিশিক্ষার প্রচলন বোধ হয়, করা যাইতে পারে।

"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"—ধর্ম্মকে যদি এরূপ উদারভাবে গ্রহণ করা যায়, তবে এরূপ ধর্ম্মশিক্ষা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই, বোধ হয়, গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে। কাজেই নীতিশিক্ষা এই ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া ভারতে বেশ প্রচারিত হইতে পারে বলিয়া ক্ষিতীন্দ্রবাবুর ন্যায় আমাদেরও বিশ্বাস।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিকে নীচ কর্ম্ম মনে করিয়া লোকে যাহাতে ঘৃণার চক্ষে না দেখে, সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে এইরূপ শিক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের মতে শৈশব শিক্ষার অন্তে শিক্ষার দুইটি ধারা থাকা উচিত। যাহাদের উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধা হইবে না, যাহাদিগকে শীঘ্রই উপার্জ্জনক্ষম হইতে হইবে, তাহাদের জন্য কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়-গত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সাধারণ বিদ্যালয়ে সুপ্রণালী-বদ্ধ ব্যবসায়-গত শিক্ষা-প্রদানের সুব্যবস্থা হইতে পারে না। তাই আমেরিকা ও জাপানেও এইরূপ সরকারী বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ-দিকে আমাদের দেশের জনসাধারণের ও রাজপুরুষগণের আশু দৃষ্টি পাত করা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থকার কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধে কৃষক-রমণীদিগের সহায়তার যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা অতি মূল্যবান্।

তিনি বলেন—"কৃষিকর্ম্মকে লাভজনক করিতে চাহিলে, তাহাতে সপরিবারে লাগিতে হইবে, নচেৎ শৃঙ্খলার অভাব হইবে। পরিবারের মধ্যে যে যে-কার্য্যের উপযুক্ত, তাহার সেই কার্য্যের ভার লইয়া সুশৃঙ্খলে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। যেন মুহূর্ত্ত সময়ও অপব্যবহারে নষ্ট না হয়। কৃষকপত্নী তো লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাই বলিয়া কৃষক যখন বাহিরে লাঙ্গল দেওয়াইতেছে, কৃষকপত্নী কি সেই সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন? তাহা নহে, শৃঙ্খলার বলে তিনিও সেই সময় বাটীর অভ্যন্তরে গো-পালন, ঘুঁটিয়া প্রস্তুত, পশু-পক্ষি-পালন প্রভৃতি নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন এবং পুত্র কন্যাদিগের মধ্যেও কতকগুলি কর্ম্মের যথোপযুক্ত বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। তাহার ফলে, তাহারা ঐ সকল কার্য্যে সুশিক্ষিত ত হইয়া উঠিবেই; আবার তাহাদের শ্রমের ফলে যেটুকু লাভ হইবে, তাহাতে তাহাদের অন্ততঃ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা তো অনায়াসে হইতে পারে। নিজের রোজগারে নিজের ভরণ-পোষণ হইতেছে, এটা বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহাদের আত্মমর্য্যাদা অভিব্যক্ত হইবে।"

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্তৃক প্রবর্তিত।

আষাঢ়, ১৩২৮—জুলাই, ১৯২১।

স্থচী

৫৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীঅমূল্যচরণ সেন কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩১ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹ ; অগ্রিম যাণ্মাসিক মূল্য ১৷৹
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ (চারি আনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 695. July, 1921

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৯৫ সংখ্যা।	আষাঢ়, ১৩২৮। জুলাই ১৯২১।	১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

প্রতীক্ষায়।

যে দিন ভুলিয়া যাব
জগতের হাসিরাশি,
চলে যাবে সব স্মৃতি,
বিস্মৃতি-সাগরে ভাসি,
প্রকৃতির শোভা হেরি
মোহিত হবে না প্রাণ,
সাধ-আশা-বাসনার
হয়ে যাবে অবসান;
ভুলে যাব একেবারে
ধরণীর কোলাহল,
অপূর্ণ কামনা-ভরে
চোখে না আসিবে জল;

সুখ-দুঃখ-শোক-মোহে
ব্যথিত হবে না হিয়া,
"কর্ম্ম" ও "বিশ্রাম-শান্তি"
সব যাব পাশরিয়া;
যেদিন স্মৃতির মোহে
হব না আপনা-হারা,
ডুবিবে নয়ন-তলে
অরুণ-চাঁদিমা-তারা;—
উজলি উঠিবে হিয়া
অবনী-নাথের ভায়,—
চেয়ে আছি শূন্যপানে
সে-দিনের প্রতীক্ষায়।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

স্মৃতিহারা।

(৭)

তিন চার জায়গায় বদ্‌লি হওয়ায় নানা-স্থানের জলে সুশীলের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া আসিল। নূতন ডেপুটি-মুন্সেফের ভাগ্যে প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর স্থানেই বদ্‌লি হইতে হয়; তাহার উপর পরম আতিথ্যপরায়ণ ম্যালেরিয়া-নন্দোদয় নূতন অতিথিকে অতিসাদরেই প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করেন। সুশীলও তাঁহার সে আতিথ্য হইতে বঞ্চিত হইল না; প্রায়ই মধ্যে মধ্যে জরে পড়িতে লাগিল এবং যথাসাধ্য কুইনাইন চাপা দিয়া গা ঝাড়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোহিনুর তাগাদা আরম্ভ করিল,—'হয় ছুটি নাও, নয় কাজ ছাড়িয়া দাও; প্রাণটা তো আগে রাখা চাই।' কিন্তু এই সময় একটু উন্নতির আশা থাকায় সুশীল ছুটি লইতে অনিচ্ছুক ছিল; বরং একটু অত্যধিক খাটুনীতে কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিবারই চেষ্টায় ছিল। ইহা লইয়া কোহিনুরের সঙ্গে খণ্ডপ্রলয়ের সূচনা হইলেও সুশীল নীরবে সেটা হজম করিবার চেষ্টা করিত। সে-দিন সুশীল যখন জানাইল, 'আজ ১টার ট্রেণে আমায় মফঃস্বলে বাহির হ'তে হবে, তখন কোহিনুর বলিল, "আজ যে রোদ, দুপুর-বেলায় না গিয়ে রাতে বেরুলে হত না? এবার জর থেকে উঠে তো এখনও ভাল সারতে পারলে না! আবার ভাদ্দুরে রোদ লাগাবে?"

সুশীল ড্রয়ার হইতে নিজের জামা-কাপড় টানিয়া বাহির ক'রতে করিতে বলিল, "না গো না! যা'দের পরের চাকরী করতে হয়, তা'দের রোদ-বৃষ্টি অত দেখ্‌লে চলে না। তুমি আমার খাবার-টাবারগুলো এই বেলা ঠিক ক'রে ফেল দেখি। তেওয়ারী যেন বরফের বাক্স আর কুঁজোটা নিতে ভোলে না। জল হ'লেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে।"

অভিমানক্ষুব্ধস্বরে কোহিনুর বলিল, "কি দুঃখে এ কষ্ট করা, তার ঠিক নেই। আমি স্পষ্ট বলছি, আমার এ-সব ভাল লাগে না কিন্তু! ফের যদি জর হয়, আমি তোমায় নিয়ে নিশ্চয় বাড়ী চলে যাবো।"

"বেশ গো সে যখন যাবে যেও না; এখন তো আমায় আগে বিদায় কর।"

কোহিনুর দুর্ব্বল স্বামীকে মফঃস্বলে ঘুরিতে ক্রমাগতই বিষম আপত্তি করিত। আজ তাহার অন্তঃকরণ আরও প্রবলভাবে বাধা দিতে উদ্যত হইল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল,—এই শরীরে এই রৌদ্রে ঘোরার ফল বড় বিপজ্জনক হইবে, কিছুতেই সুশীলকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সুশীল যখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সে কি করে? নিতান্ত অনিচ্ছায় কোহিনুর স্বামীর দ্রব্যাদি গুছাইতে গেল।

সুশীল মফঃস্বলে চলিয়া গেল; কোহিনুরের প্রাণটা যেন হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে তখন অসহায়ের যে একমাত্র সহায়, তাঁহাকেই ডাকিতে লাগিল—"সুশীল যেন ভালয় ভালয় ফিরিয়া আসেন; প্রভু, সকল আপদে তুমি তাঁকে রক্ষা করো।"

কোহিনুর পিতাকে পত্র লিখিল,—"এ চাকরী আর পোষায় না। এক তো এখানে

না ভাল ডাক্তার, না ভাল ঔষধ-পত্র! তার উপর নিজের শরীর বলিয়া একটু যে গ্রাহ্য তা আপনার জানতার নাই! আমার কথাও কানে নেন্ না। এমন করিয়া ক'দিন তাঁর দেহ টেঁকিবে জানি না। বাবা, আপনি আমাদের লইয়া চলুন।"

তিন দিন পরে পাল্কীতে শোয়াইয়া সুশীলের অচৈতন্য দেহ লইয়া তেওয়ারী আসিয়া পৌঁছিল। দিবারাত্র কোহিনুর যে ভয়ে শঙ্কিত হইয়া থাকিত, তাহাই ঘটিল। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া কোহিনুর স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল, ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে পথে ৩।৪ ঘণ্টা খুব বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছিল। ক্যাম্পে ফিরিয়াই জ্বর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অচৈতন্যভাব। কত কষ্টে যে সে বাবুকে বাড়ী আনিয়াছে, তাহা আর সে কি বলিবে! তেওয়ারী বারংবার বলিতে লাগিল, "দিদিমণি, বাবুকে নিয়ে বাড়ী চল, আর এখানে থাকিয়ো না।"

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন; কোহিনুর পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। সুশীল একেবারে অচৈতন্য! কোহিনুর পিতাকে কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিল।

সুশীলের বাড়ী আসিবার মুহূর্ত্ত হইতে কোহিনুর সেই যে সুশীলের পার্শ্বে গিয়া বসিল, সেই পর্য্যন্ত তাহার নিজের আহার-নিদ্রা একেবারে মাথায় উঠিল! বাড়ীতে মা কিংবা অপর কোনও আত্মীয়া থাকিলেও বকিয়া ঝকিয়া যাহা হোক্ করিতে পারিতেন, চাকর-বাকর আর কি করিবে? তাহারা ভয়ে ভয়ে দুই-একবার আহারের জন্য অনুরোধ করিয়া তাড়া খাইয়া সরিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর হইতে সুশীল বড় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল ও দুই-চারিটা ভুলও বকিতে লাগিল। কোহিনুর অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মুখের উপর পড়িয়া সুশীলকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু সুশীলের জ্ঞানের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। অভাগিনীর জগৎ-চিত্রে নিষ্ঠুর দেবতা মসীর পর মসী ঢালিতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর সুশীল একটু স্থির হইল। কোহিনুর ভাবিল ঘুম আসিতেছে; কিন্তু ক্ষণ-পরে কোহিনুরের তৃষিত শ্রবণ-পথে অমিয়-ধারার মত প্রবেশ করিল—"কোহিনুর!" আজ কয়দিন পরে স্বামীর মুখে তাহার নাম শুনিয়া রোদন অসংবরণীয় হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া সে উত্তর করিল, "এই যে আমি!" সুশীল ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আরও কাছে এস; ভাল করে তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না তো! কোহিনুর, আমি বড় দুর্ব্বল, তোমার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে দাও।" কোহিনুর স্বামীর জ্বর-তপ্ত হাতখানি নিজের দুই-হাতের ভিতরে তুলিয়া ওষ্ঠে স্পর্শ করিল। সুশীল বুঝিতে পারিল, কোহিনুর কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে সুশীল বলিতে লাগিল,—"কেন কাঁদ্‌ছ, কোহিনুর? আমি চলে যাচ্ছি বলে? আবার তো আমাদের দেখা হবে!" সুশীল নিজের ক্ষীণ দুর্ব্বল বাহুখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া আবার বলিল, "ওই স্বর্গে, কোহিনুর, ওই স্বর্গে আবার আমাদের তো দেখা হবে। আমি দু'দিন আগে চল্লুম যাই তো নয়!" কোহিনুর এবার ক্রন্দন আর রোধ করিতে পারিল না—আকুলকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "অমন কথা বল

না, ওগো ব'ল না! আমায় ফেলে যেও না!"

সুশীল কোহিনুরের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "কেঁদ না, একটু স্থির হও! তোমার সঙ্গে আর দুটো কথা ক'য়ে নিই।—কোহিনুর, দেখ দেখ! সম্মুখে দেখতে পাচ্ছ?" কোহিনুর বিস্মিত হইয়া উত্তর দিল, "কই, কি দেখ্‌ব?"

"ওই দেখ কোহিনুর, দু'দিন আগে গেলেই কি কেউ কাউকে ভুলে যায়! ওই দেখ আমার পিতামহী এসেছেন, ওই দেখ দুই হাত বাড়িয়ে আমায় ডাকছেন—'সুশীল, আমার কোলে আয়!' কোহিনুর আজ আমি যাই; আবার দু'দিন পরে আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব।"

কোহিনুর দুই হাতে স্বামীকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি শুধু আমারই; আমার বুক থেকে আর কা'র সাধ্য তোমায় নেয়? যদি যাই, দু'জনেই যাব।"

"বেশীদিন তো নয়, ঠিক্ এম্নি দিনে এই সময়ে তুমিও যাবে। ভয় কি!" সুশীলের মুখ হইতে এই কয়টী কথা পরিষ্কাররূপে বাহির হইল এবং তাহার পরও সুশীল আরও খানিক অনর্গল বকিয়া গেল, কিন্তু সে-সমস্তই অসংলগ্ন-প্রলাপমাত্র। রাত্রি যত শেষ হইয়া আসিতে লাগিল সুশীলের স্বর ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। কোহিনুর কত ডাকিল, কত কাঁদিল, সুশীল আর বুঝিতে পারিল না। প্রভাতের অনতিপূর্ব্বে সন্ধিক্ষণে সব ফুরাইয়া গেল!

"ওগো মা, কি হ'ল!" বলিয়া কোহিনুর সুশীলের দেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

যখন প্রভাত-রৌদ্র ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন দ্বারের নিকট হইতে কোহিনুরের কানে বাজিল—"সুশীল!" মাথা তুলিয়া সে দেখিল তাহার পিতা কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। তখনও কোহিনুর সুশীলের দেহের উপরই পড়িয়াছিল। সে যে মৃতদেহ, তাহার মূর্চ্ছা-দুর্ব্বল মস্তিষ্কে তখনও সেটা ধারণায় আসে নাই। সে ভাবিল, তাহার সুখ-শয্যায় স্বামীর বিশাল বক্ষে দেহ ঢালিয়া অগাধ নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া এই বুঝি সে জাগিতেছে। পিতার সম্মুখে আপনাকে সেই অবস্থায় শায়িত দেখিয়া লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেই, সুশীলের মৃত্যু-বিবর্ণ মুখ তাহার চক্ষে পড়িয়া গেল এবং রাত্রির সর্ব্বনাশ ও তাহার মূর্চ্ছার কথা মনে পড়িয়া গেল। "বাবা কি দেখতে এলে!" বলিয়া কোহিনুর আছড়াইয়া মণিমোহনের পায়ের উপর পড়িল। শয্যায় সুশীল ও পদতলে কোহিনুরের দিকে চাহিয়া মণিমোহন স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৮

মণিমোহন যখন ডাক্তার লইয়া রওনা হন, সরোজাও তখন আসিবার জন্য একান্ত জিদ ধরিয়াছিলেন; কিন্তু অনেক কষ্টে মণিমোহন তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। রোগী লইয়া আসিবার সময় বাড়ীতে কেহ না থাকিলে সব বে-বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে; এরূপ অবস্থায় রোগীর নানা অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। সেখানে পৌছিয়া নিয়মিত টেলিগ্রাম করিলে, সরোজা প্রত্যহই সংবাদ পাইবেন। তারপর দুই এক দিনেই তো তাঁহারা সুশীলকে লইয়া আসিয়া পৌছিবেন। এই সকল ভাবিয়া সরোজার আর যাওয়া হয় নাই।

মণিমোহনের যাওয়ার পর সরোজা

আকুলদৃষ্টিতে পথ চাহিয়াও একখানি টেলিগ্রাম বা কোন একটু সংবাদ পাইলেন না। ভাবনায় আহার-নিদ্রা মাথায় উঠিল। তবু মানুষের মন আশা ত্যাগ করিতে পারে না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, রোগী লইয়া তাদের ঝঞ্ঝাট ত কম নয়! সেই জন্যই ব্যস্ততা বশতঃ হয় ত মণিমোহন এখানকার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন; কিংবা হয় ত টেলিগ্রাম করিয়াছেন—পৌঁছে নাই। এমনও ত প্রায়ই হয়। তাঁহারা কখন কোন্ সময় হয় ত আসিয়া পৌঁছিবেন। রাস্তা দিয়া গাড়ী গেলেই সরোজা ছুটিয়া দরজায় দাঁড়াইতে লাগিলেন। পথে কেহ জোরে কথা কহিলেই, মণিমোহন আসিয়াছেন ভাবিয়া সরোজা ব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিতে লাগিলেন। এরূপ উৎকণ্ঠায় যখন ৩ দিন গত হইয়া গেল, তখন সরোজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চতুর্থ দিনে বহু কষ্টে রুদ্ধ অশ্রু আর বাধা মানিল না। সেদিন ঘর-কন্নার কাজ যেখানকার যা' পড়িয়া রহিল। ভূমিশয্যায় দেহ ঢালিয়া অনশনে থাকিয়া সরোজা কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রায় সন্ধ্যা হব হব, এমন সময় প্রাঙ্গণ হইতে স্বামীর কণ্ঠস্বর সরোজার কানে গেল। সরোজা বুঝিল, এবার আর ভুল নয়, সত্যই মণিমোহন আসিয়াছেন। চিন্তাক্লিষ্টা অনশনশীর্ণা সরোজা ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কই, আমার সুশীল কই?" কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে সরোজার চোখে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জগৎ কালিমময় হইয়া গেল। দেখিলেন, তাঁহার প্রভাতপদ্মের মত কোহিনুর অবনতমুখে দাঁড়াইয়া দুই চোখের জলে ভূমি সিক্ত করিতেছে আর দুই হাতে কোহিনুরকে বক্ষের কাছে ধরিয়া উন্মাদমূর্ত্তিবৎ মণিমোহন দাঁড়াইয়া আছেন। সরোজাকে দেখিয়া মণিমোহন বলিয়া উঠিলেন, "এই নাও তোমার হতভাগিনী! তোমার সুশীলকে আর আন্‌তে পারলুম না।"

"অ্যাঁ! ওগো কি বল্লে?" বলিয়া ছুটিয়া যেমন আসিতে যাইবেন, অমনি মাথা ঘুরিয়া সরোজা পড়িয়া গেলেন। কাছেই একটা পাথরের থামের কোণে লাগিয়া তাঁহার মাথার খানিকটা কাটিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে হু হু করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

"ও মা গো, একি হ'ল গো", বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া কোহিনুর মায়ের মাথার কাছে বসিয়া পড়িল অচৈতন্য; জননীর রক্তাক্ত মস্তক কোলে তুলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, 'কে আছিস্, জল আন্, পাখা আন। বাবা, শীগ্‌গীর ডাক্তার ডাকুন।—ও মাগো, তুমিও আমায় ফেলে যেও না মা।

বিপদের উপর আকস্মিক বিপদে মণিমোহন প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই একজন ভৃত্যকে ডাক্তার ডাকিতে আদেশ দিলেন। অভাগিনী কোহিনুর নিজের শোকের আগ্নেয়গিরি বুকে চাপিয়া জননীর শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইল।

দিনের পর দিন চলিতে লাগিল, কিন্তু কোহিনুরের হৃদয়ের ব্যথা তো কই কমে না। জগতের গতিই কি আজ-কাল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! বায়ু, জ্যোৎস্না, সবই কি কোহিনুরের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষময় হইয়া গিয়াছে! পৃথিবীর শোভা-সম্পদ সত্যই কি বিকৃত, না। শুধু কোহিনুরের হৃদয়েই তাহারা শোকপ্রদ? কালস্রোত তো অবিরাম

প্রবাহিত হইতেছে! কোহিনুরের অন্তরের জ্বালা এত দীপ্তশিখায় অবস্থিত কেন?

সেই যে জননী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, কোহিনুর বহু শুশ্রূষা করিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলে এবং সেই অবধি সে মায়ের সম্মুখে আর চক্ষের জল ফেলে নাই; পাছে আবার সে মাকে হারাইতে বসে। কিন্তু এরূপ না হইয়া যদি সে মায়ের গলা ধরিয়া খানিক কাঁদিতে পাইত, তাহা হইলে শোকের দারুণ তীব্রতার হাত হইতে সে একটুও নিষ্কৃতি পাইত! সারাদিন অসহ্য ব্যথা বক্ষে চাপিয়া সে দিনের নানা কর্ত্তব্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখে কিন্তু রাত্রিতে যখন সকল কর্ম্ম তাহাকে অব্যাহতি, দেয় তখন অন্তর্নিহিত শোকানল তীব্রভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া দেয়। তখন গৃহ-মধ্যে নিঃশব্দে শয্যাতলে পড়িয়া থাকা অসহ্য হইয়া উঠে। কোহিনুর তখন ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া উন্মুক্ত আকাশের তলে ধূলার উপর আপনার দেহ লুটাইয়া দেয়; তার পরে তা'র সদ্যঃ ছিন্ন হৃদয়ের আর কোন সংজ্ঞা থাকে না! স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সে একমনে তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে। চক্ষের জলে ভূমী সিক্ত হইয়া যায়! কখন বা বর্ষার বারি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার দেহের উপর বর্ষিত হইতে থাকে, কোহিনুরের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ থাকে না। প্রভাতে অপর সকলে জাগিবার পূর্ব্বে উঠিয়া সে গৃহকক্ষে আবার প্রবেশ করে। কিন্তু তবু সকল দিন তাহার এ বৃত্তান্ত পিতামাতার অগোচর থাকে না। এক এক দিন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে কোহিনুরের শয্যা শূন্য দেখিয়া বাহিরে খুঁজিতে আসিয়াই কন্যার ভূলুণ্ঠিত দেহ তাঁহাদের চক্ষে পড়ে। সে-দিন আর কাহারই চক্ষে নিদ্রা থাকে না। শোকাশ্রু-সিক্ত বিনিদ্রচক্ষে ধূলায় বসিয়া সকলের রাত্রি অবসান হয়।

সেবার সমস্ত আশ্বিনমাস দারুণ বর্ষা গেল; এবং সমস্ত বর্ষার জল সারারাত্রি ধরিয়া কোহিনুরের দেহ সিক্ত করিতে লাগিল। কার্ত্তিক-মাসে বর্ষা গেল বটে, কিন্তু হিম পড়িতে আরম্ভ হইল। তখনও কোহিনুরকে ছাদে পড়িতে দেখিয়া সরোজা কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "এম্নি করে তুই আত্মহত্যা করবি! এই হিমের সময়ও তুই ছাদ ছাড়্‌বি নে?"

"মা আমার আর যা বল, পারব, কিন্তু রাত্রে আমি বন্ধ ঘরের মধ্যে কিছুতে থাক্‌তে পারি না; আমার নিঃশ্বাস-বন্ধ হ'য়ে আসে! যেন রাতটুকু মা আমায় বাইরে থাক্‌তে দিও, নইলে দেখো, আমি হয় মরে যাব, নয় যা ভয় কর্‌ছ, পীড়িত হয়ে পড়্‌ব।"

কিন্তু এ কথা কি মায়ে শোনে। তিনি নিষেধ করিলেন। নিষেধ-কান্নাকাটির মধ্যেও কোহিনুর সমস্ত কার্ত্তিক-মাসও বাহিরে পড়িয়াই কাটাইল। কিন্তু অগ্রহায়ণ-মাসে সরোজাও নিদ্রাত্যাগ করিলেন। মাতাকে ঘুমন্ত ভাবিয়া কোহিনুর যেমন আসিয়া বাহিরে শুইয়া পড়িত, সরোজাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহার শিয়রে বসিতেন; তখন কোহিনুর বাধ্য হইয়া কক্ষে উঠিয়া যাইত।

কিন্তু মা যেজন্যে করিলেন এক, ফলে হইল অন্যরূপ। সারারাত্রি স্বামীকে ডাকিয়া কাঁদিয়া কোহিনুর যে তৃপ্তি পাইত, তাহার বুকের যে গুরুভার লাঘব হইত, এখন

দিবারাত্র তাহা অন্তরে গুমরাইতে থাকায় কোহিনুর শীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। আহার তো নামমাত্র ছিল; তাহাও দিন দিন কমিয়া আসিতে লাগিল। পৌষমাসে মধ্যে মধ্যে জ্বর দেখা দিতে লাগিল। সরোজা স্বামীকে বলিলেন, 'চল দু'দিন বেড়িয়ে আসি'; তীর্থে তীর্থে ঘুরলে কোহিনুরের মনটাও একটু সারবে। মেয়ের যে দশা হ'তে আরম্ভ হ'ল, ওকেও বুঝি আর রাখ্‌তে পারি নে!"

মাঘমাসের প্রথমেই সকলে যাত্রা করিলেন; একস্থান হইতে অন্যস্থান করিয়া ক্রমাগত দেশ ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু কোহিনুরের শারীরিক বা মানসিক কোন উন্নতিই দেখা গেল না। পিতামাতা সঙ্গে লইয়া যান, সে যায়; যাহা করিতে বলেন সে করে—এই মাত্র। নিজের কোন কৌতূহল কি উৎসাহ, কিছুতেই পরিলক্ষিত হয় না। দেখিয়া দেখিয়া সরোজার বুক ফাটিয়া যায়! তবু যদি এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একটুও মনের পরিবর্ত্তন হয়, ভাবিয়া তিনি কেবলি এ-দেশ সেদেশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফাল্গুনমাসের শেষের দিকে কোহিনুরের জ্বর ফুটিয়া দেখা দিল;—সঙ্গে সঙ্গে কাসি। সরোজা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "কোহিনুর, তোর মনেও এই ছিল!" কোহিনুর মায়ের কথায় কোন উত্তর না দিয়া একবার মুখ তুলিয়া ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া কি স্মরণ করিল, তারপর ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল। সে যে অনেক আশা করিয়া সুনীলের পথ চাহিয়া আছে, সত্যই কি তাহার সে-দিন আসিবে? সে সরোজাকে বলিল—"মা! তোমার কোহিনুর তো অনেক দিন মরিয়াছে! তার মৃত কঙ্কাল ধরিয়া রাখিবার জন্য তোমাদের এত বৃথা চেষ্টা কেন?"

মণিমোহন সকলকে লইয়া শিমলা গেলেন। সেখানে কয়েক মাস কোহিনুরকে একটু ভাল দেখা গেল। এই সময় বিষয়কার্য্যোপলক্ষে একবার দেশে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। দিল্লীতে কোহিনুরের মামা ডাক্তারী করিতেন। তাঁহার কাছে সরোজা ও কোহিনুরকে রাখিয়া মণিমোহন চলিয়া গেলেন।

শ্রাবণমাসে জ্যোৎস্না-রজনীতে কোহিনুর একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা এই পূর্ণিমায় না ঝুলন?' সরোজা সম্মতিসূচক উত্তর দিলে কোহিনুর বলিল, 'চল না মা! বৃন্দাবনে গিয়ে ঝুলন দেখে আসি। এত কাছে তো রয়েছি!" এত দিনের ভিতর কোহিনুর এই প্রথম একটী নিজের সাধ প্রকাশ করিল। এত দুঃখেও আনন্দে সরোজার হৃদয় ভরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন, "এক্ষণি চল! এতো কাছে-ই কি! যদি দূরের পথও হ'ত, তুমি যেতে চাইলে, তাও আমি এখনি নিয়ে যেতাম।"

পরদিনই যাত্রা করা হইল। বৃন্দাবনে ঝুলন দেখার পর সরোজা ফিরিতে চাহিলে কোহিনুর বলিল, "মা, বৃন্দাবন আমার বেশ লাগ্‌ছে; এখানে কিছুদিন থাক্‌ না?" কোহিনুরের ইচ্ছার উপর কোন দিনই কাহারও আপত্তির কিছু ছিল না। আর এখন এই সর্ব্বপরিত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর সাধে কে বাধা দিবে? সরোজা আনন্দে সম্মতি জানাইলেন।

আবার সেই ভাদ্রমাস আসিল। কোহিনুরের বিক্ষত হৃদয় আকুল আহ্বানে ডাকিতে

লাগিল—'এইদিনে আসবে বলে গিয়েছিলে, এই তো সেদিন এসেছ! আমি যে এক বৎসর পথ চেয়ে আছি! কোথায় আছ? সঙ্গে নাও, সঙ্গে নাও।'

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি কোহিনুরের আবার জ্বর বাড়িল। সরোজা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "আর এখানে থেকে কাজ নেই মা! চল তোমায় নিয়ে বাড়ী যাই।" কোহিনুর কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "তাই চল, বাবাকে লেখ, তিনি এসে নিয়ে যান।" সরোজা মণিমোহনকে আসিবার জন্ম পত্র দিলেন। কোহিনুর মনে মনে বলিল, "প্রিয়তম! এই যমুনাপুলিনে চিতা সাজিয়ে সুখের ঘুম ঘুমাবার সাধ করেছিলাম, কিন্তু তুমি দাসীকে নিতে এলে না? না আস, যেখানে তুমি আসবে সেই আমার সুখস্বর্গ; কিন্তু আর ভুলে থেক না. আমি অনেক দিন তোমার পথ চেয়ে আছি।"

সেদিন সন্ধ্যার পর মণিমোহন আসিয়া পৌছিলেন; সুতরাং, খাওয়া দাওয়ার, বন্দোবস্ত করিতে একটু রাত্রি হইল। বাসার সবই নূতন পরিচারক; সুতরাং কোহিনুরের গৃহে একটী বালক ভৃত্যকে বসাইয়া সরোজাকে রন্ধন-গৃহে যাইতে হইল। মণিমোহন নিকটেই কোন মন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়াছিলেন, তখনও ফিরেন নাই। তখন শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদ পশ্চিমে অস্তোন্মুখ। কোহিনুরের খাটের সম্মুখেই পশ্চিম দিকের খোলা জানালা দিয়া ক্ষীণ জ্যোৎস্নারেখা গৃহের ভিতরে আসিয়া পড়িতেছে। কোহিনুর শয্যায় পড়িয়া একমনে সুশীলকে চিন্তা করিতেছে। সহসা জানালার দিকে চাহিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল!—জানালার শ্বেতপর্দ্দা একপাশে গুটান ছিল, তাহার উপর আধ আলো আধ ছায়ায় মনে হইতেছিল, একজন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। সেই অবস্থায় কোহিনুরের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক নিরন্তর চিন্তার প্রভাবে তাহাকে সুশীল বলিয়া ধারণা করিল। মনের অমানুষিক উত্তেজনায় কোহিনুর চিৎকার করিয়া খাট হইতে লাফাইয়া পড়িল,—'এসেছ! এতদিনে এসেছ! আর আমায় রেখে যেও না।' বলিয়া অগ্রসর হইয়া যেমন সে তাহাকে ধরিতে যাইবে অমি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। বালক ছুটিয়া আসিয়া ধরিবারও সময় পাইল না। কোহিনুরের চিৎকার ও পতনের শব্দ সরোজার কানে পৌছাইতেই তিনি ছুটিয়া আসিলেন। কোহিনুরকে অজ্ঞান দেখিয়া সরোজার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভৃত্যকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, হঠাৎ বিছানা হইতে নামিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছেন। পরক্ষণেই মণিমোহন আসিয়া পড়িলেন। তখন ডাক্তার-ডাকা ঔষধ আনায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কিন্তু শত চেষ্টাতেও সে-রাত্রে কোহিনুরের চৈতন্য-সঞ্চার হইল না।

প্রভাত হইতে কোহিনুর কথা কহিল বটে, কিন্তু সে কেবল প্রলাপবাণী। সে তাহার সুখের জীবনের গৃহস্থালীর কথা। কখনও সে সুশীলকে দুর্ব্বল শরীরে কাছারী করার জন্ত অনুযোগ করিতেছে, কখনও বলিতেছে, 'স্নান তৈরী স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে! এখনও উঠবার সময় হ'ল না? তোমার ও নথিগুলোয় আগুন ধরিয়ে দেব। কখনও সুশীলের অসুখে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে ও চাকরদের বরফ-ঔষধের জন্ম তাগাদা করিতেছে; কখনও বা মৃদু মধুর হাসিয়া সুশীলের রহস্যালাপের উত্তর দিতেছে।

ডাক্তারের উপর ডাক্তার, ঔষধের উপর ঔষধ! কিন্তু বারংবার বৃথা চেষ্টা! সকলই বিফল হইতে লাগিল। সরোজা ও মণিমোহন অর্দ্ধোন্মত্তের মত দুহিতার মুখের প্রতি চাহিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

সরোজা দুধের গেলাস লইয়া ডাকিলেন—"কোহিনুর খাওতো মা!" একমুখ মধুর হাসি হাসিয়া কোহিনুর বলিল, "কোহিনুর কি! আমি তো তোমার 'নূরজাহান!' আজ কত দিন তুমি ও-নাম করে আমায় ডাক নি। আমায় কোহিনুর বল্লে তো আমি উত্তর দোব না!" সরোজা মণিমোহনের হাতে দুধের গেলাস দিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষত-হৃদয়ে এ কি বেদনা-ঘাত! মণিমোহন ডাকিলেন, "মা দুধ খাও!"

কোহিনুর বলিতে লাগিল,—"বল এবার আমায় ফেলে যাবে না? সঙ্গে করে যদি নিয়ে যাও, তবেই খাব। নইলে কেমন করে খাওয়াবে খাওয়াও দেখি!"

অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় মণিমোহন দুধ খাওয়াইলেন, কিন্তু সে অতি অল্পমাত্র; ক্রমে বিকারের প্রলাপ অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ-পথ্য খাওয়ান অসম্ভব হইয়া পড়িল; চিকিৎসকেরা একে একে বিদায় লইয়া গেলেন। সরোজা তো আশা ত্যাগই করিয়াছিলেন; মণিমোহনও মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। মৃত্যু তাহার কাল ছায়া লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী

"এষণা।"

(১)

মরণের হাঁক হাঁকিয়া
ভৈরব রবে শঙ্খ কাহার
উঠে দূরে ওই বাজিয়া?
থেমে গেছে আজ শত কলরব,
চারিদিক্ শুধু নিথর নীরব;
মাঝে মাঝে কা'র রুদ্র বীণায়
ঝঙ্কার উঠে [illegible]গিয়া—
মরণের হাঁক হাঁ[illegible]য়া!

(২)

কে আসিবি ওরে, [illegible] আসিবি তোরা,
কে তোরা আসিবি আয়!
সুদূর হইতে আহ্বান কা'র
ওই শোনা যায়—যায়!
আয় আয় ওরে গৃহ-কোণ ছাড়ি,
মায়ের চরণে দিতে হবে ডালি,
চল্ রে আজিকে চল্ তাড়াতাড়ি,
বেলা যে বহিয়া যায়!
কে আসিবি ওরে, কে আসিবি তোরা,
কে তোরা আসিবি, আয়!

(৩)

জীবন মরণ চরণের তলে
সবলে পিষিয়া দলিয়া,
আয়—আয়—ওরে চলিয়া!
আয় আজ একা, আয় দলে দলে
রুদ্র-দেবের প্রাঙ্গণ-তলে
উল্কা যেমন ছুটে চলে ওগো
ঘন তমিস্রা মথিয়া,—

ওরে জীবন মরণ চরণের তলে
সবলে পিষিয়া দলিয়া।

(৪)

নূতন সূর্য্য উদিছে গগনে
টুটিয়া কুহেলি কালো।
ঘাটে মাঠে বাটে বিজন আবাসে
গিরি-নদী-ধারে আকাশে বাতাসে
বিহগের নীড়ে, বন-গহ্বরে
শুধু আলো আর আলো!
ভয় নেই ওরে, ভয় নেই তোর
টুটিছে কুহেলি কালো!

(৫)

ধরণীর আজ পোহায়েছে নিশা,
পাখীরা উঠে যে গাহি!
থাকিস্ নে ওরে শিথিলহৃদয়ে
জড়িত-নয়নে চাহি!
প্রহরের পর চলিছে প্রহর,
ভাবিবার আর নাহি অবসর,
সরে যেতে হবে, চলে যেতে হবে
অচেনা পন্থা বাহি।
ওরে ধরণীর আজ পোহায়েছে নিশা,
পাখীরা উঠে যে গাহি!

(৬)

হিয়ার মাঝারে আসিছে ভাসিয়া
কা'র আহ্বান-বাণী!
কত জনমের পরিচিত সে গো
মনে হয়, জানি জানি!—
তাহার বীণার হেম তারে তারে
কত মূর্চ্ছনা ঝরে শতধারে,
মৃত্যু-লহরী পড়ে যে লুটিয়া
চুমি' ও আসনখানি।
কে অদূরে ওই—সোনালী বেলায়
ডাকিতেছে হাত ছানি!—

(৭)

হায় সে কি সুখ অসীম পাথারে
ঢেউয়ের মতন ছুটিতে—
নাহি আগু-পিছু, নাহি-ক ভাবনা,
শুধু ছুটা-ছুটি, কর্ম্ম-যাপনা,
পাহাড়ের মত ফুলিয়া উঠিয়া
চূর্ণ হইয়া মিশিতে!

(৮)

সরিয়া দাঁড়াও রয়েছ যাহারা
রোধিয়া সমুখে পন্থা,
দূর হয়ে যাও সব লাজ-ভয়,
সব বন্ধন, সব সংশয়,
মরণ-তূর্য্য বাজায় আজিকে
স্বয়ং মরণ-হন্তা!

(৯)

"আজি মুক্ত-পরাণে অতলের মাঝে
ঝাঁপায়ে পড়িতে চাই,
অশনির মত আকাশ চিরিয়া
ছুটে যাই,—ছুটে যাই!—
দৈন্যের যেথা অট্টহাস্য,
বিফলতা আছে মেলিয়া আস্য,
অবিচার যেথা ভেঙ্গে দেয় বুক,
মৃত্যু মাগিছে ঠাঁই,
সেথা চল ছুটে যাই—যাই!—"
নীরবতাময় মরণ-শান্তি
জীবনেতে নাহি চাই!
মোরা নাহি চাই,—নাহি চাই!—"

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

এলিজাবেথ ফ্রাই।

"আমরা নারী　　বিশ্বজননীর ছবি,
　　আমাদের শত্রু মিত্র নাই ;
বরিষার ধারা সম　　অজস্র জননীপ্রেম,
　　সর্ব্বত্র ঢালিয়া চলে যাই।"

আবির্ভাব ও তিরোভাব জগতের নিয়ম। ধর্ম্মরাজ্যে এক মহাপুরুষের পর আর এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের জ্যোতিঃ অম্লান ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ; জ্ঞানরাজ্যে এক মহাপণ্ডিতের পর আর এক মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিয়াছেন ; কর্ম্মজগতেও এইরূপ এক কর্ম্মবীরের পর আর এক কর্ম্মবীর অবতীর্ণ হইয়া সেবাধর্ম্মের মহিমা প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। জগতের ইতিহাসের পত্রে পত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

মহাপ্রাণ হাওয়ার্ড যে মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার শেষ হইতে না হইতে, বিধাতার দুর্জ্জের ও দুর্ব্বোধ্য বিধানে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হইল।—ইংলণ্ডের মহাকাশ হইতে একটী সমুজ্জল তারকা অন্তর্হিত হইল!—য়ুরোপীয় সমাজের ম্লান দৃশ্য অপসারিত হইতে না হইতেই আবার তাহা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। য়ুরোপে কর্ম্মের যে দুন্দুভি ধ্বনিত হইয়া সুপ্ত সমাজকে জাগরিত করিয়াছিল, নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, স্পন্দনরহিত নির্জ্জীব জীবনে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা হঠাৎ নীরব হইল।

এইরূপ সময়ে হাওয়ার্ডের আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তি সাধনের জন্যই যেন বিধাতার শুভ ইচ্ছায়, ইংলণ্ডে একটী রমণীরত্নের আবির্ভাব হইল। ইনিই এলিজাবেথ ফ্রাই নামে পরিচিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী নরউয়িচ-নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এলিজাবেথ ফ্রাই বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। আত্মোন্নতি ও পরহিত-সাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। জীবনের প্রথম ভাগে স্বীয় চরিত্রের উন্নতি-সাধনার্থ তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। পণ্ডিত-প্রবর সক্রেটিসের মহামূল্য উপদেশ-বাক্য অনুসরণ করিয়া জীবনের পূর্ব্বাহ্ণেই তিনি নিজের আত্মার সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়-স্থাপনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অকপটচিত্তে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বকীয় চরিত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি উহার দোষসমূহ সংশোধনে নিযুক্ত হইলেন। নিজের চরিত্রের দুর্ব্বলতাসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি অনেক সময় নিজেই লজ্জিত হইতেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি রিপুপরতন্ত্র হইয়া জীবন কাটাইতেছি ; ইন্দ্রিয়সমূহের উপর আমার কোনওরূপ ক্ষমতা নাই। তাহারাই আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। আমি ইহা জানিতে পারিয়াও নিজেকে বশে রাখিতে পারিতেছি না ; চরিত্র-সংশোধনে আমার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।" পরক্ষণে তিনি প্রকৃত বীর-রমণীর ন্যায় সাহসে বুক বাঁধিয়া আবার দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিবার জন্য রণক্ষেত্রে রণচণ্ডীর দৃঢ়সংকল্প লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা

করিতেছেন, 'আমি কখনও চপলতা প্রদর্শন করিব না, কখনও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইব না, অতিরঞ্জন প্রভৃতি দোষ হইতে সদা বিমুক্ত থাকিব ; আমি কখনও বিলাসিতার প্রশ্রয় দিব না কখনও অলস চিন্তার আশ্রয় লইব না ; কুপ্রবৃত্তি দমন করিয়া সদ্‌বৃত্তিরাজির দ্বারা হৃদয়কে সুশোভিত করিব ; অযথা রহস্য- বা কৌতুক-দ্বারা কাহারও মনে কষ্ট দিব না।"

ধর্ম্মই মানব-জীবনের সাররত্ন। ইহাই মানুষকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে। ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই মানব জগতের হিতানুষ্ঠান করিয়া স্মরণীয় ও বরণীয় হয় এবং অনাবিল আনন্দস্রোতে ভাসিতে থাকে। জীবনের উষাকালেই এলিজাবেথের হৃদয় ধর্ম্মের এই স্নিগ্ধ জ্যোতিতে আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষা, নৃত্যগীতাদি তরল আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে তিনি ভালবাসিতেন না। ধর্ম্মচিন্তা, পরসেবা প্রভৃতি উদার-ভাবরাজি তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং, বিশ্বমানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া মানব-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা প্রদর্শন করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া তিনি জগতের প্রকৃত মঙ্গল-সাধনে সমর্থ হইবেন, কি উপায়ে তিনি তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য দেশের ও দশের কাজে নিয়োগ করিয়া তাঁহার জীবন ধন্য করিবেন, তাহা তিনি খুজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

হাওয়ার্ডের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কারাগারের অবস্থা আবার পূর্ব্বাকার ধারণ করিল। কারাবাসিগণের উপর নৃশংস ও অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল ; তাহাদের আর কষ্টের সীমা রহিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্রেট-বিটনে যে সকল কারাগার ছিল, তাহাতে নিরপরাধ ও দোষী-সাব্যস্ত লোক একত্র বাস করিত। কারাগারে নানাপ্রকার ব্যাধি ও সংক্রামক-রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কারাগারগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার কোন চেষ্টা হইত না ; রোগী ও নীরোগ ব্যক্তিদিগকে একত্রই রাখা হইত। ইহারই ফলে শত শত কারারুদ্ধ ব্যক্তি কালের করালগ্রাসে পতিত হইত। জেলের রক্ষকগণ অতিনির্দ্দয় প্রকৃতির লোক ছিল। তাহাদের চরিত্রে সাধুতার লেশমাত্র ছিল না। অর্থলালসায় প্রণোদিত হইয়া তাহারা কারাবাসিগণের নিকট হইতে এমন কি উৎকোচ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। যাহারা তাহাদের মনস্তুটিসাধনে অসমর্থ হইত, নিরপরাধ সাব্যস্ত হইলেও তাহারা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত না।

কোন কোন কারাগার এমন জীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখপ্রায় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে কারাবাসিগণ অবলীলাক্রমে কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিতে পারিত। এই জন্য তাহাদিগকে সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া স্থূল কাষ্ঠখণ্ডে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। কাহারও পাদদেশে ও গলদেশে লৌহশলাকা স্থাপন করিয়া অতীব নির্ম্মমভাবে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করা হইত। অধিকাংশ কারাগারই মূষিকের আবাসভূমি ছিল ; আবার সেই ক্ষুদ্র জীবগুলি এত দুঃসাহসিক ছিল যে,

নিদ্রিত অবস্থায় অনেক সময় তাহারা কারাবাসিগণের বদনমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত; সুতরাং, কারাবাসীদিগকে সেখানে অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে রাত্রিযাপন করিতে হইত।

কোন কোন জেলে কারাকক্ষগুলি মৃত্তিকার অনেক নীচে অবস্থিত ছিল, তাহাতে বায়ু ও আলোক প্রবেশের পথ ছিল না; এমন কি দিনমানেও তথায় ভীষণ অন্ধকার বিরাট দৈত্যের মত বিরাজ করিত। সেই সূচি-ভেদ্য অন্ধকারে আবৃত আর্দ্র কক্ষমধ্যে ভূমির উপর কারাবাসিগণকে শয়ন করিতে হইত। কোন কোন জেলে কয়েদিগণকে পরিমিত আহারপর্য্যন্ত প্রদান করা হইত না; অর্দ্ধাশনে বা অনশনে তাহারা অতিকষ্টে দিনপাত করিত। নরকের বিভীষিকা সেখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিত। পাপের সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিলে সকলেরই শরীর শিহরিয়া উঠিত। সুরাপানাসক্ত নরনারী নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় সেই পথে ধাবিত হইতেছিল। জেলে কোনও দান-পরায়ণ ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, কয়েদিগণ তাঁহাদের নিকট হইতে যে অর্থ পাইত, তাহার দ্বারা মদ্য প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য ক্রয় করিত। এমন কি, জেলখানার তত্ত্বাবধায়কগণ তাহাদের এই পাপাচরণে প্রশ্রয় প্রদান করিত। তাহারা প্রকাশ্য-ভাবে কয়েদিগণের নিকট মদ্য বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেও কুণ্ঠা অনুভব করিত না।

জেলখানায় কয়েদীদিগকে অপরাধের তারতম্য-অনুসারে অথবা বয়সের অল্পাধিক্য-অনুসারে বিভিন্ন স্থানে রাখা হইত না। ভ্রান্তমতি কোমলবয়স্ক বালকদিগকে অনেক সময় ঘোর দুষ্ক্রিয়াসক্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের সঙ্গে মেষপালের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এইরূপে বালক-চরিত্রে সংস্কারের কোন লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইত না, বরং তাহারা দিন দিন পাপের পথে অগ্রসর হইত।

কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ অনেক সময় পরস্পরের সহিত মারামারি করিত। অনেক সময় তাহারা জানালার ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া দিয়া পথিকের অঙ্গ হইতে শিথিল বসন-ভূষণ কাড়িয়া লইত। রক্ষকগণ ইহাতে কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া, বরং তাহাতে আনন্দ অনুভব করিত। একদিন একজন শাসনকর্ত্তা স্ত্রীলোকদের জেল পরিদর্শনের জন্য অরক্ষিত অবস্থায় গমন করিয়াছিলেন। যখন তিনি কয়েদিগণের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহারা হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহার পরিহিত বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি সবিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় তাহাদিগের দিকে শূন্য অথচ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহারা এতই দুর্দ্দান্ত ছিল যে, ধর্ম্মযাজক-পর্য্যন্ত তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করিতেন্ না। জানালা হইতে দূরে নিরাপদ্ স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার দৈনিক উপাসনা-কার্য্য সমাধা করিতেন্।

যখন ইংলণ্ডের কারাগার-সমূহের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন এলিজাবেথ একদিন এক কারাগারের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। শীত-কাল; টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। দারুণ শীতের কন্‌কনে হাওয়া গায়ে কাটা ফুটাইতেছে। এই সময়ে কারাগারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শৃঙ্খলাবদ্ধ একদল বন্দী পাথর ভাঙ্গিতেছে। এই ঘোর শীতেও তাহাদের

গাত্র হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহাদের মুখ বিবর্ণ; দেহ অস্থি-কঙ্কালসার; মৃত্যুবিভীষিকা যেন তাহাদের বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে। যখন এই করুণ দৃশ্য এলিজাবেথের নয়নপথে পতিত হইল, তখন তাঁহার দয়াপ্রবণ, পরদুঃখকাতর হৃদয়ে স্নেহ-পারাবার উথলিয়া উঠিল। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যদের দুঃখ দুর্গতি-মোচনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ভগ্নহৃদয় লইয়া তিনি বিষণ্ণবদনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি কারারুদ্ধ হস্তপদবদ্ধ বন্দিগণের দুঃখমোচন-চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিল।

তিনি স্বচক্ষে জেলখানার সমস্ত অবস্থা দেখিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট ও আগ্রহান্বিত হইলেন। নরউয়িচ-সংস্কারাশ্রমের বন্দিনী-গণের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহার আগ্রহা-তিশয্য দেখিয়া, তাহার কুতূহল-চরিতার্থ করিবার জন্য একদিন তদীয় পিতা তাঁহাকে লইয়া সেই আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তিনি রমণীগণের যে ম্লানছবি দেখিতে পাইলেন, তাহা জীবনে কখনও বিস্মৃত হ'ন নাই। নারীজীবনের এইরূপ হীন শোচনীয় পরিণতি যে ঘটিতে পরে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এই লাঞ্ছিত ললনাগণের দুর্গতিমোচনে ও উন্নতি-বিধানে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্রশক্তিদ্বারা কিরূপে সহায়তা করিতে পারেন, তাহাই এখন তাহার চিন্তার বিষয় হইল।

কয়েক বৎসর এইরূপে অতীত হইল। এলিজাবেথ নিজের জীবন কোন্ পথে পরিচালিত করিবেন, তাহা তখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে সন্ন্যাসীর সরল জীবন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। সমস্ত বিলাস-বাসনা ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসিনীর ব্রত অবলম্বন এবং কৃষ্ণবর্ণের বসন, শ্বেতবর্ণের উত্তরীয় (kerchief) ও বদ্ধ অবগুণ্ঠন প্রভৃতি সন্ন্যাসিনীর উচিত চিহ্নসমূহ ধারণ করিলেন। তিনি যে-সকল বসন-ভূষণ পরিধানে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্তা ছিলেন, তাহা এবং এমন কি, তাঁহার রক্তরাগরঞ্জিত সর্ব্বপ্রিয় পোষাকটীও অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিলেন। অশন-বসন, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্ত্তা, সকল বিষয়ে তিনি সংযত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এলিজাবেথের এই বৈরাগ্যভাব-দর্শনে তাঁহার পিতা চিন্তান্বিত হইলেন। বিলাস-বৈভবপূর্ণ লণ্ডন-সহরের হাবভাব ও চালচলন দেখাইয়া স্বীয় কন্যার মতিগতি-পরিবর্ত্তন-মানসে তিনি তাঁহাকে লইয়া লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে অবস্থান কালে এলিজাবেথকে নৃত্যগীত ও নাট্যাভিনয় প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ দেখাইয়া বিলাস ব্যসনের পথে লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। কিন্তু হায়! অল্পবুদ্ধি মানব! তুমি অন্তর্মুখ, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার প্রয়াসী সাধু-সজ্জনকে পাপ-প্রলোভনের সম্মোহন চিত্র দেখাইয়া বিপথ-গামী ও ধর্ম্মহীন করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? পাপের প্রতি তোমার এত আসক্তি কেন? পুণ্যময় ধর্ম্মজীবনের প্রতি তুমি এত বিরাগভাব পোষণ কর কেন? নরকের দৃশ্য তোমার এত প্রিয় কেন? জগতের ইতিহাসে সয়তানের এইরূপ প্রচেষ্টা বহুবার নিষ্ফল হই-য়াছে; এবারও নিষ্ফল হইল। এলিজাবেথের

দৃঢ়সংকল্প অটুট রহিল। তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনার নিকট পাপ-প্রলোভন পরাজয় স্বীকার করিল। তিনি বিলাস-ব্যসন ও নৃত্যগীতাদি আমোদ-প্রমোদ একটির পর একটি ত্যাগ করিলেন এবং স্বকীয় স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দীনদরিদ্রই তাঁহার উপাস্য দেবতা হইল? তাহাদের দুঃখ-দুর্গতি-বিমোচনই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল।

প্রতিদিন তিনি প্রতিবেশী বালক-বালিকাকে সমবেত করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। ছাত্রের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অবশেষে ছাত্র-সংখ্যা প্রায় সত্তর জন হইল। এমন সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন যে, বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার শিক্ষা-কৌশল দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহার নব-জীবনের সূচনা হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন যে, মানবকুলের কল্যাণার্থ তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিবেন্। (ক্রমশঃ)

ঈশ্বরানুভূতি।

সংসারে প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন, আজ যে বালিকাটী সকলের আগে খাইবার জন্য ব্যস্ততা দেখাইতেছে বা রোদন করিতেছে, কিছুদিন পরে গৃহিণীর পদবীতে আরোহণ করিবামাত্রই তাহার সে ব্যস্ততা, সে রোদন-গুঞ্জন আর থাকে না। তখন সে সকলকে আহার করাইয়া তবে আহার করে। একটীও প্রাণী অবশিষ্ট থাকিতে তাহার মুখে অন্ন তুলিতে কষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? ইহা কি সামাজিক নিষ্ঠুরতার চিহ্ন? না। জগতে প্রথম যে-দিন মানুষ আর একজনকে খাওয়াইবার অধিকার পায়, আর একজনকে কিছু দিবার তাহার সামর্থ্য জন্মে, সে-দিন সে দেখে—নিজে খাওয়া অপেক্ষা অপরকে খাওয়াইয়া বেশী সুখ, নিজে লওয়া অপেক্ষা অপরকে দিয়া বেশী আনন্দ। পূর্ব্বোক্ত স্থলেও এইরূপ আনন্দই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এ-সুখ—এ আনন্দ চিরস্থায়ী হয় না। আবার কর্ম্ম-কোলাহলে নরনারী যখন আপনাকে ব্যস্ত করিয়া তুলে, যখন সর্ব্বত্রই সে আপনাকে খুঁজিয়া বেড়ায়—সকল কাজের মধ্যেই আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, তখন আর তাহার সে-সুখ ত থাকেই না, পরন্তু ব্যস্ততা থামিবামাত্রই বিষাদের একটা ঘনছায়া আসিয়া তাহার মনঃপ্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন মানুষ ভাবে—এ-বিষাদ-কালিমা তাহার অন্তরে কেন? ধীর ব্যক্তিমাত্রই জানেন, তখন কে যেন তাহাকে দেখাইয়া দেয়, এবং সে নিজেও দেখিতে ও বুঝিতে থাকে যে, সেখানে সে স্বয়ং গ্রহীতা, সেই স্বয়ং ভোক্তা; অপরে সেখানে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দাতা বা ভোজয়িতা; তাই এ বিষণ্ণতা—এ-গ্লানি। প্রত্যুপকারের আশা ছাড়িয়া ধীর ব্যক্তি যখন পরের জন্য কাজে মন দেয়, কাজ

সমাপ্ত করে, তখন তাহার প্রাণ সে-মুহূর্ত্তে বলিতে থাকে—'আঃ, কি তৃপ্তি!' অমনি কৃতজ্ঞতা-প্রশংসার আবেগস্রোতে হৃদয়ে অহমিকা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সে মানুষ ভাবে, না জানে সেকি মহান্ কাজের লোক, না জানে কি একটা মহাকাজ সে করিয়া ফেলিয়াছে! 'অমনি হৃদয়-কুটীরে বিষাদের উঁকি-ঝুঁকি পড়িয়া যায়! তখন আবার সেই মানুষ ভাবে এ মালিন্য কেন?—এ বিষাদচিত্রের অবতারণা কেন?' জিজ্ঞাসুব্যক্তি জানেন, তখন কে যেন উত্তরে বলিতে থাকে—'ওখানে তুমিই গ্রহীতা, তুমিই ভোক্তা, তাই ঐ বিষাদ-মালিন্য।' বাস্তবিকই তখন সে বুঝিতে পারে যে সে-কথাটী ঠিক্। প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক চিন্তার স্পন্দনে যখন এই দুইটী বিপরীত দাতা ও গ্রহীতার ভাবের পরস্পর সংঘর্ষ হইতে থাকে এবং একের উপর অন্যের জয়-পরাজয় মানুষ উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন তাহার মনে হয়, কে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া সকলই দেখিতেছেন ও বলিতেছেন—'যদি অন্তরে সত্য সুখের অধিকারী হ'তে চাও, তবে আমাকে সব দাও, ও-সব যে আমারই, আমিই যে সকলের মূল-মালিক! তোমরা আমার প্রাপ্য কখন তোমাদের নিজেদের মধ্যে কখনও বা স্বয়ংই তাহা ভাগ বাটুয়া করে নাও, তাই ত প্রাণবস্তু—সে যে সব জানে কাহার কোন্‌টী—শান্তি মান্‌তে চায় না।' জ্ঞত-ধনের মালিক মানুষ। সে-ধন প্রকৃত অধিকারীকে না দিলে কি প্রাণ কখনও শান্তি পাইতে পারে!' একের জিনিষ অপরকে প্রদান করিলে ত অশান্তি, চঞ্চলতা ঘটিবেই ঘটিবে। ইহাতে আর বিচিত্র কি আছে! এই জগতের অণুপরমাণু হইতে বৃহৎ বস্তু, সকলই পরমেশ্বরের সৃষ্ট, সকলই তাঁহা-কর্ত্তৃক বিধৃত রহিয়াছে এবং অন্তে সকলই তাঁহাতে বিলীন হইবে। সুতরাং ঈশ্বরই ত মূল, তিনিই ত সর্ব্ব কর্ম্মাকর্ম্মের প্রকৃত উৎস ও অধিকারী। তাঁহাকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিতে না পারিলে—সমুদায় তাঁহাতে ও সমুদায়ে তিনি—এই অনুভূতি হৃদয়ে না আসিলে, মানুষ কখন প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না। সুখ ত প্রীতি হইতেই উৎপন্ন। এই প্রীতি বিশুদ্ধ হইলে আনন্দও নির্ম্মল হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব অন্তরের প্রীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পায়? অমুক অমুক বস্তু বা বিষয়ের প্রতি তাহার প্রীতি আছে, অমুক অমুক বস্তু বা ব্যক্তি তাহাকে প্রীতিদান করে। মানুষ যখন এই প্রীতির মালিক ঈশ্বরকে না করিয়া স্বয়ং বা অপর কাহাকেও সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে, তখনই তাহার প্রীতি বিকৃত হয় ও বিকৃত সুখ উৎপন্ন করে।

পত্নী স্বামীকে যে ভালবাসে, সে ভালবাসার কারণ পতি নয়, কিন্তু পরমেশ্বর পতিতে বিদ্যমান থাকিয়া সে প্রীতির উদয় করিতেছেন। জায়াকে কামনা করেন বলিয়াই জায়া যে পতির প্রিয়তমা হইয়াছে, তাহা নহে;—পতি জায়ার মধ্যে সেই ঐশী-সত্তাকে ভালবাসে বলিয়াই জায়া তাহার প্রীতি-পাত্র হইয়াছে। ধন, জন, পুত্র প্রভৃতি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতি প্রীতিও মানুষের ঐশী-সত্তার প্রতি স্বাভাবিক প্রেম-বশতঃই উৎপন্ন হইতেছে। যে-মুহূর্ত্তে মানুষ এই প্রীতির মধ্যে ঈশ্বরকে না খুঁজিয়া আপনাকে খুঁজে,

অমনি সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে; আর তাহার সে পূর্ব্ব-প্রীতির অবস্থা থাকে না। এই বিষয়টাই উপলব্ধি করিয়া বোধ হয় গায়ক গাহিয়াছেন—

"যখন ভেবে চিন্তে দেখি,
(দেখি) আমার বল্‌তে আমার
তোমা বিনা আর কেউ নাই।
যত মহামূল্য ধন প্রাণপ্রিয় জন,
তোমারে হারালে সব হারাই।
*　*　*　*
(প্রভু) ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি,
চির-বাসস্থান চির-জন্মভূমি,
(যত) আত্মীয়-স্বজন, হারান রতন,
একাধারে প্রভু তোমাতে পাই।"

সুতরাং সমুদায় বস্তু তাঁহা হইতে আসিতেছে, সকল কর্ম্মের মূলে তিনিই রহিয়াছেন, কর্ম্মের ফলাফল মানবের স্বকীয় নহে, যদি যশোলাভ হইয়া থাকে তবে সে যশ তাঁহারই, যদি অপযশ হইয়া থাকে, তাহাতেও দুঃখ করিবার কিছু নাই, কারণ তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া, তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে।—মানবের এইরূপ অবস্থা কি চমৎকার—কি অপূর্ব্ব!

কি ধনী কি দরিদ্র, কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ—সকলেই প্রাণময় পরমপিতার নিকট হইতে জীবন ও জীবনীশক্তি পাইয়াছে। যাঁহারা এই জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপভোগ করিতে করিতে তাঁহারই প্রিয়কর্ম্ম সাধন করেন, তাঁহারা জানেন, বিধাতার কি অপূর্ব্ব অনুগ্রহের অধিকারী হইয়া তাঁহারা জীবন-যাপন করেন! কিন্তু হায়, যাহারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া বাহ্যকর্ম্ম বা বাহ্যবস্তুর দ্বারা যশোভাজন হইতে চাহে, স্বকীয় গুপ্ত স্বার্থসিদ্ধিতেই সচেষ্ট থাকে, তাহারা কদাপি প্রকৃত আনন্দ পায় না;—তাহাদের চিত্ত প্রসারিত হয় না, বরং দিনে দিনে সে-হৃদয় সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ থাকিয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে ও নানা-বিষয়বাসনায় জড়ীভূত হইয়া পড়ে। বড় জিনিষের ভাবনা ব্যতীত কি মানুষের মন বড় হইতে পারে? ঈশ্বর অপেক্ষা বড় আর কেহ নাই;—তিনিই ভূমা মহান্। বড়র সহবাসে মানুষ বড় হয়, ক্ষুদ্রের সহবাসে মানুষ ক্ষুদ্রতা লাভ করে।

সমুদায় ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত, তাহার দ্বারাই সঞ্জীবিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইবে; মানুষ সৎকর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া তাহার গর্ব্বানুভবের কিছু নাই, কারণ, স্বয়ং বিধাতা-পুরুষই তাহার দ্বারা সে কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া লইয়াছেন; যদি গর্ব্বানুভবের কিছু থাকে, তবে তাহা ভগবানের; গর্ব্ব ব্যতীত বরং সেই মানুষের দ্বারা যে সেই কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে, এজন্য পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতাঞ্জলি প্রদান করা কর্ত্তব্য; সমুদায় তাঁহার, মানুষ যন্ত্র,—তিনি সেই যন্ত্রের চালক! —এই অবস্থায় বৃথা যশঃস্পৃহা দূরীভূত হইয়া যায়, ঈর্ষা, দ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা সুদূরে প্রস্থান করে;—প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয়; এমন কি আত্মপ্রেম পর্য্যন্ত আর হৃদয়ে স্থান পাইতে চাহে না। কারণ, তখন ঐশ্বরিক প্রেম সমুদায় বিশ্বধামকে জয় করিয়া ফেলে এবং আত্মশক্তি সেই মহাশক্তিতে বিলীন হইয়া মহান্ আকার ধারণ করে।

যদি মানুষ যথার্থভাবে ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে দেখিবে, একমাত্র

পরমেশ্বর ব্যতীত আর প্রীতির বা অনুরাগের বস্তু কিছুই নাই। একমাত্র তিনিই মানবের চির-প্রীতির—চির-আকাঙ্ক্ষার—চির-আশার বস্তু। তিনি ব্যতীত কোনও কিছুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সকল বস্তুতেই তিনি এবং তাঁহাতেই সকল বস্তু বিরাজমান। তিনি মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী।

গানের স্বরলিপি।

কেমনে রচিলে এ বিশ্বছবি, হে সুন্দর!
কেমনে গাহিলে তুমি কবি, হে সুন্দর!
তব গ্রহ-তারা ফেরে গগনে,
তব ফুলদল ফোটে কাননে,
জনম মরণ নাচে জীবনে
তব ইঙ্গিতে, হে সুন্দর!
তোমারি সৌন্দর্য্যে শশী সুন্দর,
ফুল সুন্দর, তরু সুন্দর,
আলো সুন্দর, নিশি সুন্দর—
সুখ দুখ সব সুন্দর!
সুন্দর মম জীবন,
সুন্দর মম মরণ,
সুন্দর সব ভুবন
তব রূপে, হে সুন্দর!

রচনা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

মালকোশ—তাল ফের্‌তা।

অস্থায়ী। চৌতাল।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I I {মজ্ঞা মা। -জ্ঞা মা। -জ্ঞা -সা। ণ্‌া -সা। -জ্ঞা মা। -দা ণর্সা I
কে০ ম ০ নে ০ ০ র ০ ০ চি ০ লে০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা ণা। দদা ণা। -ণা ণা। র্সণা -দণা। দমা -জ্ঞমা। সা সা I
এ বি শ্ব ছ ০ বি হে০ ০০ সু০ ০ন্ দ র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সনা র্সণা। র্সা -ণা। -দা -মা। জ্ঞা -মা। -দা মা। -জ্ঞা মা I
কে০ ম০ নে ০ ০ ০ গা ০ ০ হি ০ লে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I ণদা নর্সা। র্সা র্সা। ণর্সা -দণা। -মদা -মজ্ঞা। জ্ঞা -মা। জ্ঞা সা} II
তু০ মি০ ক বি হে০ ০০ ০০ ০০ সু ন্ দ র

অন্তরা। ধামার।

১´ ০ ২ ০ ৩
II {মা জ্ঞা জ্ঞা। মা -া। দা দা। ণা দা দা। দা -ণা র্সা -া I
ত ব গ্র হ ০ তা রা ফে রে গ গ ০ নে ০

১´ ০ ২ ০ ৩
I র্সা জ্ঞা জ্ঞা। র্সা -া। ণা দা। ণা দা দা। মা -া জ্ঞা -া I
ত র ফু ল ০ দ ল ফো টে কা ন ০ নে ০

১´ ০ ২ ০ ৩
I সা সা সা। র্সা -া। র্সা র্সা। ণা -দা দা। ণা -া র্সা র্সা} I
জ ন ম ম ০ র ণ লা ০ চে জী ০ ব নে

১´ ০ ২ ০ ৩
I র্মা -র্জ্ঞা জ্ঞা। মা -দা। র্সা র্সা। ণা -দা -মা। জ্ঞা -মা সা সা II
ত ০ র ই ঙ্ গি তে হে ০ ০ সু ন্ দ র

সঞ্চারী। ঝাঁপতাল।

২´ ৩ ০ ১
II {মা -জ্ঞা। মা -া জ্ঞা। জ্ঞজ্ঞা -মা। জ্ঞা -া সা I
তো ০ মা ০ রি মউ ন্ দ র্ বে

২´ ৩ ০ ১
I সা -ণ্া। সা -া -া। দা -ণ্া। সা সা -া I
শ ০ শী ০ ০ সু ন্ দ র ০

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -সা। জ্ঞা -া -া। সা -জ্ঞা। মা মা -া I
ফু ০ ল ০ ০ সু ন্ দ র ০

২´ ৩ ০ ১
I মা -জ্ঞা। মা -া -া। জ্ঞা -মা। দা দা -া I
ত ০ রু ০ ০ সু ন্ দ র ০

২´ ৩ ০ ১
I দা -মা। দা -া -া। মা -দা। ণা ণা -া I
আ ০ লো ০ ০ সু ন্ দ র ০

২´ ৩ ০ ১
I ণা -দা। ণা -া -া। দা -ণা। র্সা র্সা -া} I
নি ০ শি ০ ০ সু ন্ দ র ০

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্জ্ঞা। র্সা -া -া। ণা -দা। ণা -া -া I
সু ০ খ ০ ০ দু ০ খ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I দা -া। মা -া -া। জ্ঞা -সা। সা সা -া I
স ০ ব ০ ০ সু ন্ দ র ০

আভোগ। তেওরা।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I { র্মা -ণা -দা। দা ণা। ণা দা I ণা -দা -ন্সা। র্সা র্সা। -া -া I
সু ০ ন্ দ র ম য় জী ০ ০ ব ন ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -ন্সা -র্সা। র্সা র্সা। র্মা র্জ্ঞা I র্মা -র্জ্ঞা -র্সা। র্সা র্সা। -া -া I
সু ০ নু দ র ম ম ম ০ ০ র ণ ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -ণা দা। দা ণা। ণা র্সা I ণা -দা -ণা। দা মা। -া -া I
সু ০ ন্ দ র স ব ভু ০ ০ ব ন ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা মা -জ্ঞা। জ্ঞা -মা। মা -া } I ণা -দা -মা। জ্ঞা -া। সা সা II II
ভু ব ০ ন্ন ০ পে ০ হে ০ ০ সু ন্ দ র

মালকোশ (মতান্তরে "মালকোষ") রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। জাতি = ঔড়ব। বাদী = মধ্যম, সম্বাদী = ষড়জ। ঋষভ ও পঞ্চম বর্জ্জিত। স্বাভাবিক ঠাট জ্ঞ, দ, ণ। কিন্তু কোন কোন ওস্তাদ্ ধৈবত মূর্চ্ছনায় ইহার আলাপ করিয়া পঞ্চমকে গ্রহণ করিয়াছেন, শুনিয়াছি; সে অবস্থায় নিষাদ ও গান্ধারকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। কারণ, তখন পঞ্চমকে কোমল নিষাদ করিতে হইয়াছে। শ্রুতিমধুর করিবার উদ্দেশ্যে আমি কয়েক জায়গায় সাধারণ নিষাদও ব্যবহার করিয়াছি। সেগুলির পরিবর্ত্তে কোমল নিষাদ ব্যবহার করিলে যে শ্রুতিকঠোর হইয়া উঠিবে,—তাহার কোনই মানে নাই। "তব ইঙ্গিতে" পংক্তিতে 'ত' শব্দটি তারাগ্রামে, 'ব-ই' মুদারা গ্রামে এবং 'ঙ্গি' আবার তারাগ্রামে গেয়।

লেখিকা।

টাকের ঔষধ।

গৃহস্থ বাটীতে সাধারণতঃ যে-সকল মাছি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের বিষ্ঠা টাকে মহোপকারী। যে-স্থানে অনেক মাছি আছে, এরূপ একটা স্থানে রাত্রিকালে একটা সাদা সূতা ঝুলাইয়া রাখিলে, প্রভাতে উঠিয়া দেখা যাইবে যে তাহা অসংখ্য কাল কাল দাগে আবৃত হইয়াছে। এই কাল দাগগুলি মক্ষিকার বিষ্ঠা ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাত্রিকালে বাস করিবার জন্য ঐ সূতাটীকে আশ্রয় করিয়া তাহারা উহাতে ঐসকল পুরীষোৎসর্গ করিয়াছে। এই সূতাটীকে একটী পরিষ্কার-জলপূর্ণ পাত্রে নিঃক্ষেপ করিলে ঐ বিষ্ঠার দ্রব প্রস্তুত হইবে। এই দ্রব টাকে লাগাইলে উপকার দর্শিবে। (অনূদিত)

আমার বিবাহ।

সেবার আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সরযূ বৈশাখ-মাস হইতে নানাপ্রকার পীড়ায় ভুগিতে থাকায়, তাহার দেহখানি কঙ্কালে পরিণত হইয়াছিল। অনেক চিকিৎসা করান হইল,—রোগের ও উপশম হইল বটে, কিন্তু সে-দেহে মাংস আর ফিরিয়া আসিল না। ডাক্তার হারবার্ট-সাহেব আসিয়া দেখিয়া বলিলেন—"রোগী যে-পরিমাণ ঔষধ খাইয়াছে, তাহাতে ইহার ছয় বৎসর চলিবে। অধিকন্তু এখন ইহার এই ঔষধগুলি হজম করিবার জন্ত বায়ুপরিবর্ত্তন ও ভ্রমণের দরকার।"

বাবা পূজার সময় দুইমাসের ছুটী লইয়া সরযূকে কাশীতে লইয়া যাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্গে মা ও আমার ছোটভাই ললিত যাইবে। আমার যে যাওয়া হইবে না, তাহা আমি নিজেই স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইলেও বাবা যে-দিন নিজে বলিলেন, "তোর এবার পরীক্ষা, তোর এখন কলিকাতাতে থেকে পড়াশুনা করা দরকার। তোর আমাদের সঙ্গে যাওয়া হবে না।" সে-দিন কোথা হইতে আমার মনে অভিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। তার পরদিন মা'কে বলিলাম, "ছেলে বড় হয়ে গেলে তার উপর সে-রকম মায়া থাকে না।" মা আমার কথাগুলির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "এ ধারণা তোর কোথা থেকে হ'লো, সতীশ?" আমি একটু চাপা হাসি হাসিয়া বলিলাম, "কেন? এই তোমরা তোমাদের দিয়েই বেশ বুঝ্‌তে পার। এই দেখ না আমাকে তোমরা কল্‌কাতায় একা ফেলে পশ্চিম চলে যাচ্ছ। আমি ছোট থাক্‌লে ত তোমরা এমনটা করতে পারতে না।" এ-কথা বলিবামাত্র মাতৃস্নেহের মন্দাকিনী-ধারা নয়নযুগল ছাপাইয়া কপোল-দেশ অতিক্রম করিয়া অঞ্চলে আসিয়া পতিত হইল। মা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "বাবা, ছিঃ, ও-কথা কি বলতে আছে! তোর এবার পরীক্ষা, তোর ভালর জন্তই তোকে এখানে থাক্‌তে বল্‌ছি;—নইলে কি তোকে ফেলে যাই? ও-কথা তুই মনেও স্থান দিস্ না।" মা মনে ব্যথা পাইয়াছেন বুঝিয়া আমি কোন কথা বলিলাম না। এখন সে কথা ভাবিলে মনে হয়, বাবা-মা আমাকে কলিকাতায় রাখিয়া ভালই করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে, আমার জীবননাটকে এই অভিনব সুখোদ্দীপক দৃশ্যের আবির্ভাব হইত না।

৯ই আশ্বিন বাবা মা, সরযূ ও ললিতকে লইয়া যাত্রা করিলেন; যাইবার সময় ব্যবস্থা করিয়া যাইলেন, আমি নিকটবর্ত্তী কোন 'মেসে' খাইব এবং বাহিরকার ঘরখানি অধিকার করিয়া থাকিব। বাটীর অবশিষ্ট অংশটুকু মাস-দু'য়ের জন্ত ভাড়া দিব। কারণ, কাশীর ও এখানের খরচ কুলান চাই ত! বাবা যে-দিন চলিয়া যাইলেন, সেই দিনই বৈকালে একখানি কাগজে "To let. Enquire within." লিখিয়া দরজার মাথায় টাঙ্গাইয়া দিলাম। ভাড়াটিয়া পাইতে আমাকে কোন বেগ পাইতে হইল না। পরদিনই রামদুলালবাবু নামে আমাদেরই স্বজাতীয় অপরিচিত একটি ভদ্রলোক আসিয়া মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়ায়

সেই অংশটুকু ভাড়া নিলেন এবং দুইদিন পরে পরিবারবর্গ লইয়া আসিবেন, জানাইলেন।

দুইদিন পরে ভদ্রলোকটী পরিবারবর্গ লইয়া আসিলেন। তিনি নিজে, তাহার স্ত্রী, তাহার বিবাহযোগ্যা ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক কন্যা এবং তাঁহার সপ্তমবর্ষীয় এক পুত্র,—এই চারিজন লইয়া তাঁহার পরিবার গঠিত। ভদ্রলোকটী গবর্ণমেণ্টের 'ইন্‌কামট্যাক্স অফিসে, কিঞ্চিৎ মোটা মাহিনার চাকরী করিতেন। যে-বাড়িতে তাঁহারা পূর্ব্বে ভাড়া ছিলেন, সে বাড়ীর স্বামী নিজে বাস করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে উঠিয়া যাইবার নোটিশ দেওয়ায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে সুবিধা-মত বাড়ি না পাওয়ায়, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া আমাদের বাটীর মত সঙ্কীর্ণ বাটী ভাড়া করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শীঘ্রই তাঁহার জলপাইগুড়িতে বদ্‌লি হইবারও কথা ছিল; সুতরাং, বড় বাড়ী লইবার প্রয়োজন ছিল না।

রামদুলালবাবু যেমন উদারপ্রকৃতির অমায়িক ভদ্রলোক, তাঁহার গৃহিণীটীও তদ্রূপ। তাঁহাদের আহারের কিঞ্চিন্মাত্র ঘটা হইলেই অমনি আমার নিমন্ত্রণ হইত। সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ ২।১ দিন এরূপ নিমন্ত্রণ পাইতাম। ইহাতে মেসের 'তে-তলা ডাল, ফাঁপা ভাত' প্রভৃতির দুঃখ কতকটা উপশমিত হইত। যাহা হউক, তাঁহারা আমাকে অতিস্নেহের চক্ষে দেখিতেন্। ভাড়াটিয়া আসা অবধি আমি যে 'মেসে' আহার করিতাম, সেই স্থানেই স্নানাদি সম্পন্ন করিতাম। কিন্তু ইহাতে বড়ই অসুবিধা ঘটিত। কারণ, মেসের প্রায় সকল সভাই আফিসের বাবু। কাহারও ১০টায় কাহারও বা ১১টায় আফিস। তাঁহাদের পর অপর যে ২।১ জন বাকি থাকিতেন, তাঁহারা কল দখল করিতেন্। আমার এই অসুবিধা জানিতে পারিয়া রামদুলালবাবু আমাকে প্রত্যহ আমাদের বাটীতেই স্নানাদি করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। প্রথম প্রথম বাটীর ভিতরে যাইতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইত। শত প্রয়োজন থাকিলেও একবার বা দুইবার ব্যতীত কখনও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতাম না। আমার এই সঙ্কোচভাব কেন হইল? এই রহস্যোদ্ভেদের জন্য যতই চেষ্টা করিতাম, ততই আরও জড়ীভূত হইয়া পড়িতাম; কোনও তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া বাটীর মধ্যে গমনাগমন করিলেও একদিনও রামদুলাল-বাবুর স্ত্রী কিংবা তাহার কন্যাকে দেখি নাই। তাঁহাদের কথাবার্ত্তাও শুনা যায় নাই। তাঁহারা এরূপ সংযতভাবে অবস্থান করিতেন। কিন্তু কুক্ষণেই হউক আর সুক্ষণেই হউক, একদিন হঠাৎ রামদুলালবাবুর কন্যা অমিয়ার সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল। কুক্ষণে বলি, কারণ, একদিন তাহাই মনে হইয়াছিল; কিন্তু আজ দাম্পত্যপ্রেমের অতুল অধিকারী হইয়া তাহা সুক্ষণই বলিয়া মনে হইতেছে। অমিয়া তখন জল লইতে আসিতেছিল এবং আমিও স্নানের জন্য বাটীর ভিতরে ঢুকিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে কেহই অপরের আগমনের প্রতীক্ষা করে নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে যখন দুইটি অপরিচিত যুবক-যুবতী একই স্থানে সহসা সমাগত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে বিস্ময়ের একটি চকিত প্রবাহ বহিয়া যায় এবং উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে দূরে সরিয়া

যাইতে চাহে। এক্ষেত্রেও অবিকল তাহাই হইল। যে মুহূর্ত্তে আমাদের দৃষ্টি সম্মিলিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই যেন কি একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া যাইল, কি যেন একটা অনৌচিত্যের আবির্ভাব হইল। এইরূপ একটা ভাব উভয়ের বদনেই ফুটিয়া উঠিল। আমি একপদ ভিতরে ও একপদ বাহিরে রাখিয়া কি করিব, স্থির করিবার পূর্ব্বেই সে ফিরিয়া তীরবেগে প্রস্থান করিল। উঠানে একটা ভোজনের অশুচি বাটী ছিল,—সেটী তাহার গতির অন্তরায় হইতে আসিয়া ফুটবলের অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং দূরে যাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আমিও এ-অবস্থায় অস্ফুটভাবে 'আ-হা' এই কথা-দুইটি উচ্চারণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি অন্যমনস্কভাবে স্নান সারিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়া মাথা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে ঘটনাটী আদ্যোপান্ত একবার ভাবিলাম, দুইবার ভাবিলাম;—আরও ভাবিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। মেসে আহার করিতে যাইবার সময়ও রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে যাইলাম। অনেকের মনে হইতে পারে, এত ভাবনা কিসের? কিন্তু তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে, আমি তখন অবিবাহিত এবং একটী অপরিচিতা নবমুকুলিতা সুকুমারীর সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎকার। দুই এক সেকেণ্ডের মধ্যে কাহারও রূপলাবণ্য সম্যগ্রূপে উপলব্ধি করা একবারে অসম্ভব,—কিন্তু তাহা হইলেও ঐরূপ দর্শনেই অমিয়াকে আমার অসামান্যা লাবণ্যময়ী ও রূপবতী বালিকা বলিয়া মনে হইল। সে ধারণা যে ঠিক্ হইয়াছিল, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সে-দিন আর আমার পড়িতে মন লাগিল না; শুধুই ঐ কথা ভাবিতে লাগিলাম এবং নানারূপ উপন্যাসের কল্পনা করিতে লাগিলাম। যতই ভাবি, ততই তাহাকে Wordsworth এর Phantom of delight বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে-দিন পড়াশুনা ত কিছু হইল না, রাত্রিতে ভাল ঘুমও হইল না।

পরদিন মনে করিলাম, "আজ হইতে আর স্নান করিতে বাড়ীর ভিতর ঢুকিব না; কিন্তু কি এক আকর্ষণী শক্তি আমাকে স্নান করিবার জন্য বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইল। নিমিষে একবার চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া লইলাম; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। উপরকার ঘরে কাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। একটু কান দিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, অমিয়া তাহার ভাইকে আদর করিয়া পড়াইতেছে। তাহার ঐ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিবার আমার আগ্রহ হইল। স্নান করিতে আমার প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিল। আমার মনে হয়, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের ভাব আছে। তাহা না হইলে, যাহাকে চোখে দেখিতে ভাল লাগে, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য এত আগ্রহ হইবে কেন?

যাহা হউক, আমার বাড়ীর ভিতর যাইবার মাত্রা ক্রমেই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িল। নানা-কারণে ঘন ঘন ভিতরে যাইবার অত্যন্ত প্রয়োজন হইতে লাগিল এবং প্রয়োজনের কল্যাণে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই অমিয়ার দর্শন-লাভ হইতে লাগিল। দুই-চারি বার সামনা সামনি হওয়ার পরে,

অমিয়ারও আর পূর্ব্ববৎ মারাত্মক লজ্জা ছিল না। আমার সহিত দেখা হইলে সে কিছু উপলক্ষ্য করিয়া ধীর-পাদবিক্ষেপে উপরে বা অন্যত্র চলিয়া যাইত। তাহার এ আচরণ আমার খুবই ভাল লাগিত।

একদিন আমার জ্বর হইল। তিন দিন উপবাসের পর চতুর্থদিন দুধ-সুজি খাইব স্থির করিলাম। মেসে গিয়া খবর দিয়া আসিব ভাবিতেছি, এরূপ সময় অফিসে যাইবার জন্য বহির্গত হইয়া রামদুলালবাবু বলিলেন, "আপনাকে আর খাবার জন্য কষ্ট করে মেসে যেতে হবে না, আমাদের বাড়ী থেকেই আপনাকে দুধসুজি করে দেবে।"

আমি বিছানায় শুইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই আহারের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছি এবং চক্ষু মুদিয়া কত কি ভাবিতেছি, এমন সময় "আপনার খাবার এনেছি"—এই স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম, অমিয়া একহাতে দুধ-সুজীর বাটী ও অপর হাতে একগ্লাস জল লইয়া ঐ দুইটী পাত্রকে মেজেয় রাখিবার জন্য নত হইয়াছে। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা-বোধ হইল। সে যখন কষ্ট করিয়া খাবার দিতে আসিয়াছে, তখন চুপ করিয়া থাকিলে অকৃতজ্ঞতা দেখান হয়, কিছু বলা দরকার। কিন্তু কি বলিব? অমিয়ার হৃষ্টপুষ্টতার জন্য তাহার যথার্থ বয়ঃক্রম অপেক্ষা তাহাকে একটু অধিকবয়সের বলিয়া মনে হইত; এবং আমিও বিংশতি অতিক্রম করি নাই। সুতরাং, তাহাকে "তুমি" বা "আপনি" কি বলিয়া সম্বোধন করিব ভাবিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। অবশেষে "আপনি"রই জয় হইল। আমি কুণ্ঠিতস্বরে বলিলাম, "আপনি নিজে কেন এত কষ্ট করে এ সমস্ত এনেছেন? খবর পেলেই আমি নিজেই ত উঠে যেতে পারতুম।"

জানি না কেন, অমিয়ার ভাই সুকুর প্রতি আমার একটা স্নেহের ভাব আসিয়া জুটিয়াছিল। সে প্রায়ই আমার ঘরে আসিত, আমি তাহাকে নানা-রকম ছবি আঁকিয়া দিতাম। সে ছবি পাইলেই বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইত এবং সকলকে দেখাইয়া আসিত। ছবি দেখিয়া কে কি বলিত, তাহা আমি মাঝে মাঝে সুকুর কাছেই খোঁজ নিতাম। একদিন কালিদাসের শকুন্তলায় যে স্থানে শকুন্তলা একটী ভ্রমর-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুসৃতা হইয়া তাহাকে দূর করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সেই দৃশ্যটী আঁকিয়া সুকুকে দিলাম। সে বলিল, "আজ আপনার ছবি ভাল হয় নাই।" আমি বলিলাম "আজকার ছবি অন্যদিন অপেক্ষা আমার ভাল লাগিতেছে।" সে "আচ্ছা, আমি সকলকে দেখাইয়া আসি" বলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "আজকের ছবি সত্যই ভাল হয়েছে। ছবিখানা দিদি নিয়ে নিল, আমাকে আর দিল না!" আমি বলিলাম, "তা তিনি নিন্, আমি তোমায় অন্য ছবি এঁকে দিব।" সে "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "তোমার দিদি ছবি দেখিয়া কি বলিলেন?" সুকুমার বলিল, "দিদি বলিল, 'সতীশবাবু ত বেশ ছবি আঁকতে পারেন'।" ছবিখানি সৎপাত্রস্থ হইয়াছে জানিয়া এবং অমিয়ার নিকট হইতে ঐরূপ অযাচিত প্রশংসা পাইয়া আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সেইদিন হইতে একটি

গৌণ প্রাণীর সহিত একটা মুখ্য প্রাণীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত লেখাপড়ায় অবহেলা করিয়া আমার ছবি আঁকিবার মাত্রা বাড়িল।

এইরূপ করিয়া প্রায় দেড় মাস অতিবাহিত হইল। কাশী হইতে খবর আসিল যে সরযু অনেকটা সারিয়াছে; আর কিছুদিন থাকিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারে, আশা করা যায়। বাবা আরও পনর দিনের ছুটির জন্ত দরখাস্ত করিয়াছেন।

একদিন রামদুলালবাবু আসিয়া খবর দিলেন যে, তাঁহাকে জলপাইগুড়িতে বদলি করিয়াছে এবং তাঁহাকে এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। এ-সংবাদে আর কাহারও কিছু আসিয়া গেল কি না তাহা বলিতে পারি না, তবে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটা কুসুমকোরক ধীরে ধীরে আমার হৃদয়-মধ্যে তাহার দলগুলি বিকশিত করিতেছিল, হঠাৎ কে যেন তাহাতে বাধা দিল।

রামদুলালবাবু বলিলেন, "আমি যাহাতে বদলি না হই, তাহার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সাহেব কোন কথা শুনিলেন না। তবে জলপাইগুড়ি জায়গাটি ভাল। আপনার সহিত আলাপ হওয়াতে বেশ প্রীতি লাভ করেছিলাম। আর যে সহজে দেখা হ'বে, তা বোধ হয় না।" আমি কিছু বলিলাম না। প্রাণের ভিতরে তখন একটা আবেগ গুমরিয়া উঠিতেছিল।

রামদুলালবাবুদের যাইবার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা বৈকালের গাড়িতে রওনা হইবেন। রামদুলালবাবুর স্ত্রী সুকুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ আমরা চলিয়া যাইব, সতীশবাবু যেন আমাদের এখানেই খান।" তাহাই হইল। উপকরণ যদিও বেশী কিছু ছিল না, তাহা হইলেও যাহা ছিল তাহাই আমার নিকট অমৃত বলিয়া বোধ হইল। যাইবার সময় উপস্থিত। শুনিলাম, সকলে রওনা হইতেছেন। রামদুলালবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর নিকট অজস্র অযাচিত স্নেহ পাইয়াছি, কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব ভাবিয়া পাইলাম না। সুকুর মাকে প্রণাম না করাটা ভাল দেখায় না, তাই আমি বাড়ির ভিতর চলিলাম। সুকুকে তাহার মা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে উপরে দেখাইয়া দিল। বহুদিন পরে উপরে যাইতেছি। প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। উঠিয়া দেখি সুকুর মাতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি বাঁধিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া ঘোমটা দিলেন। কিন্তু তাহার ভিতর হইতে তাঁহার মুখ বেশ দেখা যাইতেছিল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আপনি আমাকে মায়ের মতন স্নেহ করতেন, আপনারা চলেছেন, আমার দিনকতক বাসায় টেঁকা দায় হবে।" এ-কথায় কোন স্ত্রীলোকই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আমাদেরও কি আপনাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে না? কিন্তু কি করিব, উপায় ত নাই।"

অমিয়া এতক্ষণ জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের ভাবগতি লক্ষ্য করিতেছিল। আমার দৃষ্টি এখন তাহার উপর নিঃক্ষিপ্ত হওয়ায় সে মুখ নীচু করিল এবং অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জানালা খুঁটিতে লাগিল। তাহার মুখেও যেন একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশ বুঝা গেল। আমি নীচে চলিয়া আসিলাম।

গাড়ীতে জিনিষপত্র-সমুদয় উঠান হইয়াছে। সুকু গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিয়া আছে। ছোট ছেলেরা গাড়ী পাইলেই এরূপ করিয়া থাকে। এইবার রামদুলালবাবু, তাঁহার পত্নী ও অমিয়া আসিয়া গাড়িতে উঠিলেন। এইবার অমিয়া আমার প্রতি একবার চাহিল; কিন্তু তখনই আবার মুখ ঘুরাইয়া লইল। গাড়ী যখন ছাড়ে, তখন রামদুলালবাবু বলিলেন, "সতীশ বাবু, নমস্কার! তবে আসি!"

আমি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলাম, "একটা পৌছান সংবাদ দিবেন।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অমিয়া পুনরায় একবার আমার প্রতি চাহিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার মুখ ঘুরাইয়া লইল। আমি দরজা হইতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়ি চলিতে লাগিল। গাড়িখানি যখন মোড় ঘুরিল, তখন দেখি অমিয়া আমাদের বাড়ীর দিকেই তাকাইয়া আছে। সে-দৃষ্টি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল-পর্য্যন্ত ভেদ করিতেছিল। ঐরূপ নির্দোষ ও নির্ব্বিকার দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ যে ভীষণ দাবানলের সৃষ্টি করিয়া অহরহঃ আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই; অমিয়ার স্বর্ণপ্রতিমা যে আমার মানসপটে অঙ্কিত রহিয়া দিবা নিশি আমাকে মিলনের জন্য উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে বলিবে, তাহা জানিতাম না।

গাড়ি চলিয়া যাইলে আমি ঘরের ভিতর যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। তখন কতই বেদনাসূচক কথা আমার মনে আসিতে লাগিল। হৃদয়ের আবেগ ভাদ্রমাসের নদীর ন্যায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে তাহা হৃদয় ছাপাইয়া নয়নে আসিয়া দেখা দিল। আমি আর সামলাইতে পারিলাম না; কাঁদিয়া ফেলিলাম। প্রথমে শ্রাবণের বারিপাতের ন্যায় দর-দর-বেগে অশ্রু নামিয়া আসিয়া আমার বালিশ ও বিছানা ভিজাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে ধারাপাত ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের সময় যেমন অগ্নিবেষ্টিত স্থান হইতে উষ্ণ বায়ু হু-হু-শব্দে বহিতে থাকে, সেইরূপ আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ঘন ঘন উত্তপ্ত নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঘরের ভিতর আর থাকিতে পারিলাম না। বাড়ীর ভিতর যাইলাম। বাড়ীর ভিতরের দৃশ্যও অতিযন্ত্রণাদায়ক। সেই প্রাঙ্গণ, যাহা এতদিন আমার জীবননাটকের প্রথম অঙ্কের অভিনয়ের নাট্যশালারূপে বিরাজ করিতেছিল, তাহা এখন রজনীঅবসানে পরিত্যক্ত হতশ্রী রঙ্গমঞ্চের ন্যায় বোধ হইল। বাড়ীতে আর টিকিতে পারিলাম না। বাড়ীর বাহির হইয়া নিকটস্থ সরকারী উদ্যানে আসিয়া একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া আকাশপাতাল কতই ভাবিতে লাগিলাম। গৃহে ফিরিলাম, প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিলাম যে, পরীক্ষা শেষ হইলেই একবার জলপাইগুড়ি-অঞ্চলে বেড়াইতে যাইব এবং রামদুলালবাবুদের বাড়ীতে অন্ততঃ একদিনের জন্যও অতিথি হইয়া অমিয়াকে একবার দেখিয়া আসিব। এই আশাই আমাকে বাচাইয়া রাখিল।

(ক্রমশঃ)

গান।

(ভৈরবী—একতালা)

ফুল-মালা লয়ে বসে আছি প্রাতে
কা'র তরে ওগো কা'র তরে!—
মৃদু বয়ে যায় দক্ষিণ বায়,—
তা'রি কথা মোর মনে পড়ে!
ডেকে ডেকে ওঠে পাপিয়া
কি সুখ-যামিনী যাপিয়া!—
থেকে থেকে পিক চায় অনিমিক্,
থেকে থেকে কুহু' কুহরে!

সহসা কেন গো আঁখিতলে মোর
জল উঠে যেন ছাপিয়া,—
আমি হৃদয়-আবেগ রাখিতে গো নারি
বক্ষের তলে চাপিয়া!
ছুলি' ছুলি' হাসে মৃদু ফুলগুলি
আমারি নয়নে চাহিয়া!—
সে কি আসিবে না, পরিবে না মালা,
দিবে না কি মালা মোর গলে?

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

কৃষিকথা।

(১) অনুর্ব্বর পতিত ভূমিখণ্ডগুলিকে উর্ব্বর ও বৃক্ষাদি-দ্বারা পরিপূর্ণ করিবার মানসে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বৎসরে একটী দিন একটী উৎসব হইয়া থাকে। ইহাকে Arbor-day বা বৃক্ষ-রোপণের দিন বলা হয়। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে এই দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৃক্ষাদিশূন্য প্রদেশে যাইয়া এক একটী বৃক্ষ রোপণ করিয়া আসে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে বহু লক্ষ বিঘা ভূমি বৃক্ষ-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে ১২ লক্ষ বিঘা ভূমিতে কাননবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সাহায্যে বৃক্ষরোপণ করিবেন। স্কুলের একটী বালক তাহার পাঠ বা অন্যান্য কৃষি প্রভৃতি কার্য্যের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না করিয়া বর্ষে প্রায় ৪৫ বিঘা জমিতে বৃক্ষরোপণ করিতে এবং এই ভূভাগের তত্ত্বাবধান করিতে পারে। বালকদিগের কার্য্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম, শূন্যভূমিতে বৃক্ষরোপণ ও এই কৃত্রিম-কাননের তত্ত্বাবধান, এবং দ্বিতীয়তঃ স্বভাবিক বনভূভাগ নির্ব্বাচন, বৃক্ষাদির ঘন-সন্নিবেশ-দূরীকরণ এবং অল্পদিন-জাত বনভাগের তত্ত্বাবধান। বালকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ আবশ্যক যন্ত্রাদি দেওয়া হইবে এবং প্রভূত পুরস্কারও প্রদান করা হইবে। এই কার্য্য পরিচালনের জন্য যুক্তরাজ্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ছাত্রদিগের মধ্যে ৫,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছেন। এই সকল পুস্তিকাতে অতিসরল ভাষায় কিরূপ জমি কিরূপ বৃক্ষের পক্ষে উপযুক্ত, উৎপন্ন-বৃক্ষের বয়োনিরূপণ, কৃত্রিম কাননের যত্ন ও

তাহার রক্ষা করিবার প্রণালী, বনজ দ্রব্যের সদ্ব্যবহার ও তাহার দ্বারা অর্থাগমের উপায় ইত্যাদি বিষয় অতিসুন্দররূপে লিখিত আছে। বৃক্ষরোপণ-কালে, বালকেরা বৃক্ষ-সমূহের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান দিয়াছে কি না, বৃক্ষসকলের তেজ, বৃদ্ধি, তাহারা অনিষ্ট হইতে রক্ষিত হইয়াছে কি না, কোন্ কোন্ বালক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে তাহাদের বৃক্ষের যত্ন করিয়াছে, ইত্যাদি বিষয় পুরস্কার-বিতরণ-কালে বিবেচিত হইবে।

বনভূমির সহিত বৃষ্টির বিশিষ্টরূপ সম্বন্ধ আছে। যে-স্থানে নিবিড় অরণ্য আছে, সে স্থানে বৃষ্টিও প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। শূন্য মরুতে বৃষ্টি অতিশয় অল্প হয়। আমাদের দেশ কোথাও দেবমাতৃক, কোথাও নদীমাতৃক। কোনও স্থানে নদীর উপর, কোনও স্থানে বৃষ্টির উপর কৃষি নির্ভর করে। কিন্তু কি নদীর জল, কি বৃষ্টির জল, উভয়ের সহিতই অরণ্য-প্রদেশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, অরণ্য বিনষ্ট হইবার পর নদীও শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং, আমাদের দেশেও যে যে স্থানে বৃষ্টিপাতের অপ্রাচুর্য্যহেতু বৃক্ষের ক্ষতি হইতেছে, সেই সকল স্থানে বিদ্যালয়ের বালক-বৃন্দের মধ্যে উক্ত প্রকার বৃক্ষ-রোপণের উৎসবাদি প্রচলিত করিলে অতিশয় সুফল পাওয়া যাইবে। তৃণগুল্মাচ্ছাদিত শ্যামল প্রদেশ যে কেবল নয়ন-মনেরই প্রীতিদায়ক, তাহা নহে; উহা অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র দেশে মধুময় অন্নের উৎপাদনেও সহায়তা করে।

(২) ভারতের উত্তরপশ্চিমে বিকানির রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের অধিকাংশ-ভাগ রাজপুতনার মরুভূমিতে আবৃত। যদিও ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবী; কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা সেই দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কৃষিযন্ত্রাদি লইয়া বসিয়া আছে, সেই পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ভাবিত পন্থাই অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। কি হইলে উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে কোনও প্রকৃষ্ট চেষ্টা নাই। ইহার ফলে দারুণ পরিশ্রমেও উপযুক্ত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় না এবং যাহা উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা কৃষকের পরিবারবর্গের ও তাহার গো-প্রভৃতির উপযুক্ত আহারের সংস্থান হয় না। অন্যান্য দেশে যে পরিমাণ পরিশ্রম, সে-পরিমাণে শস্যও উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই ভারত সোনার ভারত হইয়াও কৃষীবলের অজ্ঞতা ও যন্ত্রাদির দোষবশতঃ পরিশ্রমের অনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করিতে পারে না। আমাদিগের কৃষকগণ সারের ব্যবহারও উত্তমরূপে জানে না। অধিকাংশস্থলে একমাত্র গোময়ই সারের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তাহাও অগ্নিজ্বলন-কার্য্যে প্রভূত-পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া যাওয়ায় সারের জন্য প্রচুর-পরিমাণে গোময় পাওয়া যায় না। কৃষির বলদ প্রভৃতি উপযুক্ত আহার না পাওয়ায় উপযুক্তরূপে পরিশ্রমও করিতে পারে না। ইহার উপর অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলে, কৃষককুলের এবং তাহাদের সহিত সমগ্র ভারতবাসীর যে দুর্দশা হয়, তাহা ত দেশবাসী সকলেই দর্শন করিয়াছেন। মরুভূময় বিকানীর রাজ্যের অবস্থা যে-কিরূপ, তাহা ইহা হইতে অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। অন্ন-সংস্থানই এখন দেশবাসীর প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। কৃষির উন্নতির দ্বারা যাহাতে দরিদ্র

অধিবাসীর এই অন্নকষ্ট দূর হয়, তজ্জন্য বিকানীর-মহারাজ বাহাদুর খৃষ্টীয় মেথডিষ্ট ফরেন মিশন্ বোর্ডকে প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ সহস্র) বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন। এইস্থানে একটী কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। বিকানীরের মহারাজ এই বিদ্যালয়টী ও উক্ত পাদ্রীদিগের থাকিবার জন্য এবং কৃষি-পরীক্ষাগার প্রভৃতির জন্য যে অট্টালিকা বাটীর প্রয়োজন হইবে, তৎসমুদয়ও নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন। যে সকল সুবিজ্ঞ কৃষিবিদ্ পণ্ডিতগণ ও প্রচারকগণ আসিবেন, তাঁহাদিগের বেতন ও আনুষঙ্গিক সমুদায় ব্যয়ভারও মহারাজ বহন করিবেন। মরুময়-প্রদেশে কৃষি অত্যন্ত কষ্টকর। আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে এক-প্রকার চাষের অতিশয় প্রচলন হইতেছে। ইহাতে জলের বিশেষ আবশ্যকতা হয় না। মহারাজ এইরূপ কৃষিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সাহায্যই প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত বোর্ড ঐরূপ কৃষিনিপুণ ব্যক্তি সংগ্রহ করিতে না পারায় এখনও মহারাজের ঐ দান-স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা আশা করেন, শীঘ্রই উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিয়া ঐ দান গ্রহণ করিতে পারিবেন। বিকানীরের মহারাজ তাঁহার রাজ্যে কৃষি-বিষয়ে যেরূপ মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই প্রশংসনীয়; কিন্তু আমাদের প্রত্যেক প্রদেশেই কৃষির উন্নতি-বিষয়ে এইরূপ বিদ্যালয় ও পরীক্ষাগার-প্রতিষ্ঠা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

আমেরিকা-যাত্রী শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর মিত্র ও শ্রীমান্ নির্ম্মলকৃষ্ণ মিত্র স্নেহের দেবর-যুগলকে—

স্বস্তি।

তরুণ বয়সে 'শ্যাম' 'নির্ম্মল' দেবর!
  ব্যবসা' বাণিজ্য শিক্ষা করিতে দু'জনে
নীরব সাধক মত নীরব উদ্যোগে
  আমেরিকা-মহারাজ্যে গিয়াছ গোপনে।
মস্তকে স্বধর্ম্ম ধরি হৃদে নারায়ণ;
  লও শিক্ষা উপেক্ষিয়া বাধা-বিঘ্ন যত;
শূর্পণখা-প্রলোভনে সংযমের অস্ত্রে—
  নাসাচ্ছেদ কোরো ব্রতী লক্ষ্মণের মত।
স্বর্গাদপি গরীয়সী দেশ-মাতৃকায়
  মুখোজ্জ্বল কোরো ভাই করি প্রাণপণ!
পুনঃ ঘরে এসো ফিরে সিদ্ধ-সাধনায়,
  চিত্তজয়ী বিশ্বজয়ী কচের মতন!
  মা-বাপের অশ্রুজল মুছিয়ো সত্বর,
  স্নেহের 'নির্ম্মলকৃষ্ণ' গো 'শ্যামসুন্দর'!

তোমাদের মেজবৌদিদি—
শ্রীসুশীলাসুন্দরী মিত্র।

পুস্তক সমালোচনা।

সোনার কমল।—একটী উপন্যাস;—শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র প্রণীত। আখ্যানটি অতি-সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত গল্পের আকারে ইহা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কমল এই গ্রন্থের নায়িকা। যখন নায়ক শ্রীপতি তাহার সত্তঃ-

প্রস্ফুটিত শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তখন সে বালিকামাত্র। বিবাহের পর পতিগৃহে কয়েকমাস সৌরভ-বিস্তার করিয়া কেমন করিয়া ফুল্লকমল সংসার-তাপ ও সমাজের অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে শুকাইয়া গেল, সে কাহিনীটী বড়ই করুণ। শেষে যখন তাহার দুঃখনিশার অবসান হইল, তখনও সে নবোদিত সূর্য্যের মত পবিত্র এবং দগ্ধ স্বর্ণের মত নির্ম্মল। নায়ক শ্রীপতি, বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ, ভৃত্য লছ্‌মীপ্রসাদ, কুটিল দুর্ল্লভ রায়, বিমলহৃদয়া বাণী প্রভৃতির চরিত্র দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে প্রফুল্লর চরিত্র। বন্ধুবৎসল স্বার্থত্যাগী পরিহাসপ্রিয়, প্রফুল্লচিত্ত প্রফুল্লের নাম সার্থক হইয়াছে।

সোনার-কমলে কীট থাকা অসম্ভব, তথাপি মুদ্রাকরপ্রমাদে ও বোধ হয়, লেখিকার ব্যগ্রতা-হেতুই কয়েকটী কীট ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদিগের আশা এবং বিশ্বাস যে, এই পুস্তিকার পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ত্রুটীগুলি দূরীকরণের চেষ্টা করা হইবে।

পুস্তকখানির বাঁধাই, মুদ্রণ, কাগজ— সকলই অতিমনোরম।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গবেষণা ও আবিষ্কার।—১। টমাস, এ, এডিসন একটি নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণের ও আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। মানুষের মৃত্যুর পর যদি সত্য সত্যই আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে এই যন্ত্রদ্বারা ইহলোকবাসীদের সহিত পরলোকবাসীদের কথা-বার্ত্তার আদান-প্রদান চলিতে পারিবে।

২। ডাক্তার মরিসন আমেরিকার একজন বিখ্যাত ডাক্তার। ইনি একশতবৎসর বয়সে চতুর্থপক্ষে মিস্ বার্ণিনাম্নী নানাদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা এক ৭২ বৎসরের কুমারীরত্নের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার মরিসন তাঁহার স্ত্রীর সহকারিতায় এমন একখানি পুস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত আছেন, যাহা প্রকাশিত হইলে চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

৩। রুষিয়ার ডাক্তার ক্রাবকফ এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত ঔষধ পিচকারী-দ্বারা শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে রোগী বহুক্ষণ অচেতন হইয়া থাকে; সেই অবস্থায় তাহার শরীরে অনায়াসে অস্ত্র-প্রয়োগ করা যায়। ক্লোরোফরম্ বা ইথারে যে-সকল উপসর্গ উপস্থিত [illegible] তাহাতে তাহার কিছুই হয় না।

৪। ইউনাইটেড ষ্টেটসের অন্তর্গত ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার সামুয়েল আলফ্রেড মিচেল একশত পঞ্চাশটী নূতন নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। নক্ষত্রের আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়, তথাপি ঐসকল নক্ষত্রের আলোক ৭০ বর্ষের কমে পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে না।

৫। ফ্রান্সের পাস্তুর ইনষ্টিটিউসনের ডিরেক্টার ডাক্তার র‍্যাপিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, টাইফয়েড, ডিসপেপসিয়া, যক্ষ্মা

প্রভৃতি রোগের বীজ লবণের মধ্যে মিশিয়া থাকিতে পারে। অনেকে পাতে লবণ খান, সেই লবণ যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাতে নানা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

রমণী ব্যারিষ্টার।—ইংলণ্ডের কুমারী ওলিভ ক্যাথারিণ ক্ল্যাপহাম মিড্‌ল্‌টেম্পল্ হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোনও নারী ব্যারিষ্টারী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন নাই। মধ্যপরীক্ষায় ১৭ জন নারী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রমণীর উচ্চপদলাভ।—মিস্ ষ্টিভেন্‌শন্-নাম্নী এক যুবতী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের "প্রাইভেট্ সেক্রেটারী"র পদ পাইয়াছেন্। এই দায়িত্বপূর্ণ সম্মানের পদ রমণীগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম লাভ করিয়াছেন। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণা। এই বিদুষী বুদ্ধিমতী রমণী সঙ্গীতপ্রিয়া।

বঙ্গনারীর প্রতিভা।—কুমারী সত্যপ্রিয়া ঘোষ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ইংলণ্ডে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। সংবাদ আসিয়াছে যে, তিনি লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব সার্জ্জনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বঙ্গনারীর গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

ঢাকায় নারী-কলেজ।—বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী জুলাই মাস হইতে ঢাকা ইডেন স্কুলের সহিত ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হইবে।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ।—কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সুইডেন গমন করিয়াছেন। সুইডেনের মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কবিবর পৃথিবীর সমুদয় জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষাব্যবস্থা।—যুক্ত প্রদেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিমিত্ত ৩৪০টি অতিরিক্ত বিদ্যালয় স্থাপন এবং ১২০টি বৃত্তি-প্রদানের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

মানচেষ্টারের লোকসান।—মানচেষ্টারের তন্তুবায়গণের খুব লোকসান হইতেছে। তাই তাহারা কলের মজুরদের বেতন শতকরা ৩০৲ কমাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। মজুরগণ ইহাতে আপত্তি করিতেছে।

মিশরে তুলার চাষ।—মিশর-গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিতে চাহিতেছেন যে, কোন কৃষক তাহার ভূমির এক তৃতীয়াংশের অধিক ভূমিতে তুলা চাষ করিতে পারিবে না।

দুর্ভিক্ষ।—খুলনার স্থানে স্থানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সার পি সি রায় মহাশয় অনাহার-ক্লিষ্ট অধিবাসীদিগের জন্য ভিক্ষা করিতেছেন। দেশবাসীকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।—এ-বৎসর নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রীকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়।—কল্যাবতী সাহ ২, জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ ১, সুরেখা নন্দী ২, সাধনা সেন ১, লীলাবতী সেন ১, ললিতা গুই ১, শিশিরকণা দে ২, নীহারবালা ঘোষ ১, লাবণ্য দত্ত ১, প্রতিভা দাস ২, তড়িৎলতা দাস ২, কাত্তিময়ী চৌধুরী ৩, জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী ২, চারুশীলা বিশ্বাস ১, সরোজ নন্দী হাজারিকা ১, অশ্রুমতী রায় ১, শান্তি দীপ্তি ২,।

ইউনাইটেড্ মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়।—রেণুকা মিত্র ১, হেমনলিনী পাল ১, লাবণ্য লতা বিশ্বাস ১, অগ্নেস মিত্র ১ রাজকুমারী সিংহ ১, লতিকা রুদ্র ১।

বেথুন স্কুল।—শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, বাণী চট্টোপাধ্যায় ১, পূর্ণপ্রভা দাস ১, কল্যাণী গুপ্ত ১, সাধনা মিত্র ১, প্রতিমা সেন ১, চারুবালা বসু ১, সুষমা বিশ্বাস ২, যূথিকা সরকার ২, প্রতিভা বসু ১, মালতী সেন গুপ্ত ১।

ভিক্টোরিয়া স্কুল।—মালতীলতা চট্টোপাধ্যায় ১, সুকৃতি রায় ১, পন্না মজুমদার ৩, সুদেবী ঘোষ ১।

ইউ, এফ, সি হাইস্কুল।—অমিয়লতা দাস ২, প্রভাসনলিনী দাসগুপ্তা ১, লাবণ্যপ্রভা মল্লিক ১, জীবনপ্রভা বিশ্বাস ৩, নির্ম্মলশান্তি বৈরাগী ১, অবলা-বালা দাস ৩, স্বর্ণময়ী মিত্র ২।

মহারাণী স্কুল, দার্জ্জিলিং।—ইলা রায় ১, কমলা দেব ১, ললিতা চৌধুরী ২।

সি, এম, এস্, ক্রাইষ্ট চার্চ হাই স্কুল।—আইরিন্ এস্ মিত্র ১, তুহিন বালা তরফদার ১, অরুণপ্রভা ঘোষ ১, ডোরথি ক্রীষ্টিন ২।

ডাওসেসন স্কুল।—লতিকা সেনগুপ্ত ২, শোভা মিত্র ২, ডারোথি নীহারবালা দাসগুপ্তা ২, প্রিমুকিলা সরোজ-যামিনী মণ্ডল ১, সুধীরা রায় ১, লীলা সেনগুপ্ত ১, মণিকাশোভনা দত্ত ১, মুক্তপ্রভা ঘোষ ২, লীলা রায় ১, জেজি সুধাময়ী সেন ১, ডোরা শোভনা সরকার ১.

প্রাইভেট্।—এসুথার মুলচাঁদ দুবে ১, কমলা সেন ৩, সুরমা সেন ২, ক্ষমলা বসু ২, সরযূবালা দেবী ২, কমলা-বতী সাহা ২, আর, লক্ষ্মী দেবী ১।

ঢাকা ইডেন হাই স্কুল।—সুলতা দত্ত ১, মনোরম বসু ১, ফজিলোতন্নেসা ১, লাবণ্যপ্রভা দাসগুপ্ত ১, মালতীবালা দাস ১, জ্যোৎস্নাময়ী লাহিড়ী ১, হীরামণি সেনগুপ্ত ১, শান্তিলতা মিত্র ১, বীণা দত্ত ১, অমিয়-বালা দাসগুপ্ত ১, যোগমায়া সেনগুপ্ত ১, শান্তিলতা দাসগুপ্ত ১, নিরুপমা সরকার ১।

প্রাইভেট।—শোভনা চক্রবর্ত্তী ৩।

হুগলী প্রাইভেট।—জেন পেরীরা ৩।

চট্টগ্রাম।—ডাক্তার খাস্তগির হাইস্কুল। সরলা বালা ভড় ১, নিরুপমা সেন ১।

বর্দ্ধমান—প্রাইভেট।—নলিনী দেবী ১।

ময়মনসিংহ, বিদ্যাময়ী হাই স্কুল।—সুষমা গুপ্ত ১, প্রতিভা দাসগুপ্ত ১, করুণাকণা দত্ত ১, সুকুমারী মুখার্জ্জি ১, সুফলা রায় ১, আশালতা সরকার ১, বনলতা সেনগুপ্ত ২।

ডিব্রুগড়।—ডাওসেসন স্কুল। সরস্বতী দত্ত ২।

প্রাইভেট।—সুবালা ঘোষ ৩।

শিলং—প্রাইভেট।—স্বর্ণপ্রভা হালদার ১, স্বর্ণলতা এগুা ১।

মেদিনীপুর প্রাইভেট।—বনলতা সরকার ১।

* ১, ২, ৩ সংখ্যাগুলিতে যথা ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ বুঝিতে হইবে।

শুভখন

ভালবাসার পন
এমনি যেন নিত্য রহে
প্রেমের ফুলবন!
কি মুহূর্ত্তে নয়ন মেলি'
তোমায় আমি হেরুহু খেলি!—
প্রাণের মাঝে স্বাধীন বাজে
জাগ্‌ল গুঞ্জরণ!

পুণ্য-গীতিশ্লোক!
আমার তুমি, নইলে কেন
দেখ্‌ছে কত লোক!
গুণও আছে তোমার গুণি,
কবির গানে তাও ত শুনি!—
রূপের প্রভা!— গুণের শোভা!
তোমায় লাগে মন!

শ্রীসুপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 696. August, 1921

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৯৬ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩২৮। আগষ্ট ১৯২১। | ১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

দুর্দ্দিনে

(পিলু-বারোয়াঁ)

দুখের দিনেও গেয়ে যারে মন!
আঁধার যে-দিন নামে,
দখিন হাওয়া থামে,
নিখিল চলে বামে,
সে-দিনও তুই গেয়ে যারে মন!
যে-দিন ঝঞ্ঝা বহে বেগে,
ঝিলিক্ মারে মেঘে,
তুফান উঠে জেগে,
সে-দিনও তুই গেয়ে যারে মন!

যদি মরণ আসে দ্বারে,
ওরে ডাকিয়া নে' তারে,
ওরে কাণ্ডারী তুই পারে,—
সে কথা কি ভুল্‌বি রে মোর মন!
আজ তবে প্রাণের সাথে বল্,—
মোদের তিনি সহায় সম্বল;
হাসির সনে অশ্রুজল
তিনি নিত্য করেন বিশ্বে বিতরণ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

এলিজাবেথ ফ্রাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এলিজাবেথ্ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জোসেফ ফ্রাই-নামক একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। কিন্তু বিবাহবন্ধন তাঁহার পক্ষে মোহের বন্ধন হইল না। তিনি বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়া স্বকীয় জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যের প্রতি কখনও উদাসীনতা. প্রদর্শন করিলেন না। সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যে তিনি ইতঃপূর্ব্বে যে ব্রত ধারণ

করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, রোগক্লিষ্ট ও কৃপার্হ ব্যক্তিগণের সেবাকার্য্যে দ্বিগুণতর উৎসাহ-সহকারে অগ্রসর হইলেন। পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাঁহার হৃদয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। মানবকুলের দুর্দ্দশার চিত্র তাঁহার সম্মুখে যতই উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি তাহাদের দুঃখবিমোচনে ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

একদিন পথিপার্শ্বে তিনি একজন ভিক্ষুক স্ত্রীলোককে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। দুরন্ত শীতকাল; শীতবস্ত্রে গাত্র আবৃত করিয়াও এই নিদারুণ শীতের প্রকোপ হইতে শরীর-রক্ষা করা অসম্ভব। এই শীতে অর্দ্ধোন্মুক্ত-দেহা, জীর্ণবসনা রমণী শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি নিজের দেহ হইতে শীতবস্ত্র উন্মোচিত করিয়া এই শীতার্ত্তা রমণীকে তাহা দান করিলেন। আর একদিন সেই স্ত্রীলোকটি একটি রুগ্নশিশু ক্রোড়ে করিয়া পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। শিশুটি রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল; কিন্তু ভিক্ষুক-রমণীর সেদিকে দৃষ্টিমাত্র ছিল না। সে তাহার ভিক্ষালব্ধ অর্থের জন্য লালায়িত। মাতৃহৃদয় যে কিরূপে এত কঠিন হইতে পারে, তাহা সন্তানবৎসলা এলিজাবেথ ফ্রাই বুঝিতে পারিলেন না। এই শিশু তবে কি এই ভিখারিণীর নিজের সন্তান নয়?—এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ভিখারিণীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রশ্নের কোনরূপ সদুত্তর প্রদান না করিয়াই ভিক্ষুক-রমণী অন্তর্হিত হইল এলিজাবেথের সন্দেহ আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি গোপনে সেই রমণীর অনুসরণ করিলেন।

সেখানে যাইয়া তিনি যে দৃশ্য অবলোকন করিলেন, তাহা অবর্ণনীয় ও অননুমেয়। তিনি দেখিলেন, একটি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গহ্বরে দশ পনরটি শিশু মেষের ন্যায় আবদ্ধ রহিয়াছে। অনাহারে তাহাদের দেহ শীর্ণ, রোগে তাহাদের শরীর জীর্ণ। এইরূপ অনাদৃত অবস্থায় চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে তাহারা দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া তিনি আর তথায় মুহূর্ত্তকালও নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার চিকিৎসকের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। চিকিৎসককে সঙ্গে করিয়া পরদিন যখন তিনি সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে সেই ভিখারিণী তাহার আশ্রিত শিশুগণ-সহ সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

তখন শিশুপালন ইংলণ্ডে একটি ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কঠোর জীবনসংগ্রামে কর্ম্মব্যস্ত নরনারী স্বীয় শিশুপালনের ভার কোনও বৃদ্ধার উপর ন্যস্ত করিয়া কলকারখানায় শ্রমজীবীর কার্য্যে রত থাকিত। সেই বৃদ্ধা শিশুদিগের মাতাপিতার নিকট হইতে তাহাদের প্রতিপালন-ব্যয়স্বরূপ কিছু কিছু অর্থ পাইত। অর্থোপার্জ্জনই সেই বৃদ্ধার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; সে শিশুদিগের জন্য কোনরূপ যত্ন লইত না। তাহার দুর্ব্যবহারে অনেক সময় শিশুগণ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। কিন্তু সে তাহা গোপন করিয়া শিশুদের জনকজননীর নিকট হইতে অর্থ-আদায় করিয়া লইত। এই সকল হৃদয়-

বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া এলিজাবেথের হৃদয়ে উত্তরোত্তর করুণার উদ্রেক হইতে লাগিল। তিনি নিঃস্ব দুর্দশাগ্রস্ত লোকের উপকার-সাধনে দৃঢ়সংকল্প হইয়া, প্রকৃত বীররমণীর ন্যায় জগতের দুঃখদুর্গতি-বিমোচনে অগ্রসর হইলেন।

এলিজাবেথ ফ্রাই দেশের যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠানেই যোগদান করিতেন। তিনি দেশের বিদ্যালয় প্রভৃতির সংস্কারসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন; শ্রমজীবীদিগের আবাসগৃহের উন্নতি-বিধানে যত্নপর ছিলেন; দেশে দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন; খনির কার্য্যে ও কারখানায় নিযুক্ত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের কষ্টলাঘব-ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য যেখানে যে আয়োজন হইয়াছে, সেখানেই তিনি সেই আয়োজনের সফলতালাভে সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মা একনিষ্ঠ-সেবিকা জগতে অতিবিরল।

যখন যে অবস্থায় যেখানেই অবস্থান করুন্ না কেন, তিনি কখনও দীনদরিদ্রের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি যখন স্বামীর সহিত তাঁহাদের গ্রাম্য আবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন প্রতিবেশিনী বালিকা-দিগের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণার্থ তিনি তথায় একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। শীতার্ত্তকে শীতবস্ত্র, রোগগ্রস্তকে ঔষধ, নিরন্নকে অন্ন প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। অজ্ঞানতিমিরাবৃত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্নীতিপরায়ণ প্রতিবেশিনীগণের চরিত্রের উন্নতি-বিধানের জন্য এবং তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রৎ করিবার জন্য, তিনি তাহাদের মধ্যে বাইবেল বিতরণ করিতেন।

তাঁহার পল্লীবাটী হইতে প্রায় আধমাইল দূরে অনেক দুঃস্থ ও নিঃস্ব পরিবার বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একবার বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। বহুলোক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। তথাকার ধর্ম্মযাজক একাকী তাহাদের দুর্দ্দশামোচনে অসমর্থ হইয়া এলি-জাবেথের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সেবাধর্ম্মের একনিষ্ঠ-সেবিকা এলিজাবেথ তন্মুহূর্ত্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় লোকদিগের যন্ত্রণাদর্শনে এলি-জাবেথের কোমল-হৃদয় বিগলিত হইল। মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে তিনি গৃহে গৃহে গমন করিয়া সকলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ও বসন্তরোগের প্রতিষেধক টীকা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। করুণারূপিণী জননীসমা এলিজাবেথ কোথাও বা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার গাত্রে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া, কোথাও বা অনশনক্লিষ্ট লোকদিগের মধ্যে অন্ন বিতরণ করিয়া, নানাভাবে তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রাণপণ যত্ন ও সেবায় অনেক লোক মহা-মারীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

এলিজাবেথের দয়া স্থানবিশেষে বা ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার মাতৃহৃদয় সমভাবে সকলের জন্য ব্যাকুল হইত। একবার একদল ভ্রমণশীল অসভ্যজাতি তাঁহাদের গ্রামের ধারে পটবাস নির্ম্মাণ করিল। তাহাদের একটি শিশু হঠাৎ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইল। শিশুর অসহায় জনক-জননী উৎকণ্ঠিত

হইয়া উঠিল। সহসা তাহাদের মধ্যে একটি দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তিনি অসভ্য-জাতীয় শিশুর শয্যাপার্শ্বে জননীর স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার যত্নে ও সেবাশুশ্রূষায় শিশুটী শীঘ্রই রোগমুক্ত হইল। সরলপ্রাণ অসভ্যজাতির লোকগণ কৃতজ্ঞতাভরে দেবীরূপা এলিজাবেথের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে বহুবার তিনি দুঃস্থলোকের সাহায্য করিয়া তাঁহার মহানুভবতা ও সদাশয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য কারাসংস্কার। তিনি দেখিলেন, হাওয়ার্ডের একাগ্র সাধনার ফলে য়ুরোপের কারাগার-সমূহের যে সকল উন্নতি হইয়াছিল, হাওয়ার্ডের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল অন্তর্হিত হইয়াছে; ইংলণ্ডের কারাগারের অবস্থা আবার অতীব শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। জেলখানার অবরুদ্ধ হতভাগ্য ব্যক্তিগণের এরূপ দুঃখ-দুর্গতির কথা অবগত হইয়া এলিজাবেথের দয়াপ্রবণ হৃদয় স্বতঃই কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইংলণ্ডের জেল-সকল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। একবার তিনি লণ্ডন-সহরের নিউগেট (Newgate) জেলখানায় যাইয়া উপস্থিত হন। তথাকার কয়েদিগণ এত দুর্দ্দান্ত ছিল যে, সেই জেলের তত্ত্বাবধায়ক তাঁহাকে কারাবাসিগণের সম্মুখীন হইতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে তাঁহাকে কারা-গারের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি কারাগারে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। স্বভাবকোমল স্ত্রীলোকগণ-পর্য্যন্ত জেলখানার দুর্নীতি-দোষযুক্ত বায়ুতে বাস করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঘোর দুর্দ্দান্ত ও দুর্বৃত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে। কারা-বাসী স্ত্রীলোকগণের অসংযত ব্যবহার, অশ্লীল-ভাষা, অশিষ্ট আচরণ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এলিজাবেথের সৌম্যমূর্ত্তি ও আড়ম্বরহীন বেশভূষা সেই দুর্বৃত্ত কারাবাসিনী-দিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহারা হাটু গাড়িয়া বসিয়া নিঃশব্দে এলিজাবেথের উপদেশবাণী ও স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল। এমন কি কাহারও কাহারও চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

এলিজাবেথকে অনেক শোক,তাপ ও দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি অনেক আত্মীয়-স্বজন হারাইয়াছিলেন; নিজেও রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; এমন কি প্রাণপ্রতিম পুত্রধন পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল বিপৎপাতে কখনও বিচলিত বা স্বীয় কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই সকল বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ্-আপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি অনন্যমনে কারাসংস্কার-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।—তাঁহার জীবনব্রতের উদ্‌যাপনে তিনি অলোকসামান্য একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন।

কঠোর শাসন ও শাস্তির বিভীষিকাময় দৃশ্যস্থল না হইয়া, কারাগার যাহাতে চরিত্র-সংশোধন-কার্য্যে যথার্থ সহায়তা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরই প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।—এই ধ্রুব বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া এলিজাবেথ সহানুভূতিপূর্ণহৃদয়ে সর্ব্বদাই কারাসংস্কার-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। নিউ-

গেট কারাগারের হতভাগিনীদের প্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়িল। তিনি সময় সময় তথায় যাইয়া কারাবাসিনীদের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে লইয়া সরল-প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সন্তানদের রুগ্নশয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে তিনি তাহাদের মধ্যে সুনীতি-প্রচার করিয়া তাহাদের নিকট দুর্নীতির পথ রুদ্ধ করিলেন।

সেখানে ক্রূরকর্ম্মা কয়েদী স্ত্রীলোকগণের উপর তিনি যে-ভাবে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও দূরদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কারাবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা তিনি তাহাদের সন্তানের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতেন। মাতৃহৃদয় যতই কলুষিত ও পাপাসক্ত হউক না কেন, সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তাহাতে সর্ব্বদাই বিরাজ করে। তাই কারাগারে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাদের সন্তানগণের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবার প্রস্তাব যখন এলিজাবেথ ফ্রাই উত্থাপন করিলেন, তখন তাহারা সকলে তাহা সাদরে গ্রহণ করিল। কিন্তু এইরূপ বিদ্যালয় পরিচালন অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্ভব। তাই তিনি একটি সমিতি গঠন করিলেন। নিউগেট-কারাগারের স্ত্রীকয়েদিগণের চরিত্র-সংশোধন ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইল। তাঁহারা কারাবাসিনীদিগের বস্ত্রাভাব দূর করিতে এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন। ধর্ম্মভাব তাহাদের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিবার জন্য এবং তাহাদের চরিত্রে মিতাচার, শ্রমশীলতা ও শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি প্রস্ফুট করিবার জন্য, এই সমিতির অধীনে নানাভাবে নানা চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এলিজাবেথ ফ্রাই নিজব্যয়ে কারাবাসিনীদিগকে পরিধানবস্ত্র ও শীতবস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন; তাহাদিগকে সর্ব্বদাই একটি শিল্প-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতেন; এবং তাহাদের শ্রমজাত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা তাহাদের চা, চিনি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দিতেন। কারাগারে তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিত না; তাই এলিজাবেথ তাহাদের শয্যার জন্য মাদুর ও শীত নিবারণের জন্য কম্বলের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; এবং যাহাতে উপযুক্ত আহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের সংস্থান হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন।

এইরূপে এলিজাবেথের ঐকান্তিক যত্নে ও সেবায় অচিরেই কারাগারের ম্লান দৃশ্য অপসারিত হইল। বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা, অশান্তির স্থানে শান্তি, দুর্নীতির স্থানে সুনীতি, শ্রমবিমুখতার স্থানে শ্রমশীলতা, অমিতাচারের স্থানে মিতাচার প্রভৃতি ধীরে ধীরে তাহাদের স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া কারাগারের নারকী বিভীষিকা প্রশমিত করিতে লাগিল। সকলে বিস্ময়ের সহিত এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া এলিজাবেথের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এলিজাবেথের খ্যাতি ও যশ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল; তাঁহার দেশবাসী নানাভাবে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। কারা-সংস্কার বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং তদন্ত-কমিটি নিয়োজিত হইল।

তারপর, ইংলণ্ডের বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুর দণ্ডবিধি তাঁহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। তৎকালে ইংলণ্ডে অতিকঠোর আইন প্রচলিত ছিল। সামান্য অপরাধের জন্য পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। নরহত্যার অপরাধে যে শাস্তি প্রদত্ত হইত, সামান্য জালের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও তদ্রূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইত। একবার একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক তাহার কম্পিতকলেবর শিশুর শীত-নিবারণের জন্য একখণ্ড শীতবস্ত্র অপহরণ করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এমন কি সামান্য একটি বৃক্ষ-কর্ত্তনের অপরাধেও বিচারকগণ ফাঁসির হুকুম দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। হুজুকের মাথায় তৃণস্তূপে অগ্নিসংযোগ করিয়া অনেক উচ্ছৃঙ্খল যুবক প্রাণ হারাইয়াছে। পথিপার্শ্বস্থ মৃতপ্রায় ছাগশিশুকে গৃহে লইয়া গিয়া অনেক ক্ষুধাতুর ব্যক্তি চৌর্য্যাভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কাষ্ঠদণ্ডে বিলম্বিত হইয়াছে।

এই সকল কঠোর ও নিষ্ঠুর শাসনের হস্ত হইতে অবোধ নিরক্ষর জনসাধারণকে মুক্ত করিবার জন্য পরদুঃখকাতরা এলিজাবেথ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। তিনি বহুবার শাসকবর্গের সমক্ষে এই সকল মূকজনমণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিয়া এই সকল অসভ্যজনোচিত আইন-সংস্কারের জন্য পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে তাহার সমস্ত চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে সমাজসেবার যে অপূর্ব্বভাব উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, তাহা দিন দিন দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দেশবাসীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইল, জনসমূহ প্রসিদ্ধনেতৃবর্গের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। অবশেষে এলিজাবেথের সাধনা সিদ্ধ হইল; ইংলণ্ডে হত্যাপরাধ ভিন্ন অন্যান্য অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান রহিত হইল।

ইহাতেই এলিজাবেথের কর্ম্মের অবসান হয় নাই। তিনি ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের হাসপাতাল ও পাগলাগারদ-সমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সকল স্থানে তিনি যে-সকল ত্রুটী দেখিতে পাইলেন, নির্ভয়ে সে-সকল কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে মতিচ্ছন্ন লোকদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হইত; হতভাগ্যদের অনেককে শৃঙ্খলিত করিয়া অন্ধকারময় গহ্বরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। কোন কোন পাগলাগারদে পাগলদিগের প্রতি পশুর ন্যায় আচরণ করা হইত; তাহাদের খাদ্যদ্রব্য মৃত্তিকার উপর কাষ্ঠপাত্রে একত্র সন্নিবেশিত হইত। এই সকল বর্ব্বরোচিত আচরণের বিরুদ্ধে এলিজাবেথ তীব্র প্রতিবাদ করেন।

কারাসংস্কার-ব্যাপারে তিনি যেমন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তথাকার নৃপতিবৃন্দের এবং রাজপুরুষগণের নিকট নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে তিনি তেমনই স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অসন্তুষ্টির ভয়ে তিনি কখনও উচিত কথা বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ফ্রান্সের রাজাকে তিনি পরিষ্কার বলিয়াছিলেন, "আপনি যখন কারাগার-নির্ম্মাণ করেন, তখন এই কথা মনে রাখিয়া নির্ম্মাণ করিবেন যে, সেই কারাগৃহে যেন আপনার নিজের সন্তানেরাও অবস্থান করিতে আপত্তি উত্থাপন করিতে না পারে।" সার রবার্ট পিল-

কেও তিনি বলিয়াছিলেন, "উন্মুক্ত আকাশমার্গ কারাবাসিগণের নিকট রুদ্ধ করিও না,—আলোকহীন কক্ষ নির্ম্মাণ করিও না; মনে রাখিও, তোমার সন্তানগণও এই কারাগারে আশ্রয় লইতে পারে।" বস্তুতঃ কারাবাসীদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা, তিনি অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচার বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং এই প্রথা নিবারণের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এইরূপে বহু হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এলিজাবেথ সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই জনমণ্ডলী তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুণ্যলাভ করিতে লালায়িত হইত। রাজা ও রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্ম ও আত্মত্যাগের প্রভাবে তিনি ধরাবক্ষে যে সুশোভন ও অক্ষয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, স্বার্থলোলুপ ও পাশববলদৃপ্ত মানব সেইরূপ রাজ্য-সৃষ্টির কল্পনা মনেও আনিতে পারে কি না সন্দেহ! হতভাগ্য নরকুলের দুঃখ ও দুর্দ্দশা-মোচনে এবং পতিতের উদ্ধার-সাধনে অর্দ্ধশতাব্দীকাল অক্লান্তভাবে ও একাগ্রচিত্তে পরিশ্রম করিয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি জগদ্বাসীর সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের বক্ষে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে।

গান।

(কালাংড়া—কাশ্মিরী খেম্‌টা)

আকাশ বাতাস আলোক এসে
প্রাণ-সায়রে ঢেউ তুলেছে!
নিখিল আজি মধুর দেখি,
কাহার হাসির ঢেউ দুলেছে!
আজ বিশ্বলোকের মর্ম্ম-কমল
দেখ্‌ছি যেন দল খুলেছে—
আজ চিত্তকমল সেও জেগেছে,
প্রেমে গানে সব ভুলেছে॥

নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

স্মৃতিহারা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৯)

সাধু রমানাথ সাধু বটে, কিন্তু তিনি গৈরিক-ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসী বা তিলককণ্ঠীধারী বৈরাগি-শ্রেণীভুক্ত নহেন। যৌবনে পিতৃ-বিয়োগের পর যখন দারিদ্র-কশাঘাতে জর্জ্জর হইয়া নিজের বা স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন তিনি যাহা অতিসহজ পন্থা, সেই পন্থা অবলম্বন করিলেন;—রমানাথ

সাধু সাজিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। বাড়ীতে মা ও স্ত্রী দুর্ভাগ্যের অতল সমুদ্রে পড়িলেন, সত্য; কিন্তু, রমানাথের সে-যাত্রা যথার্থই সুযাত্রা হইয়া গেল। সেবারে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা ছিল। বিনা চেষ্টায় উদরপূর্ত্তি ও সাধুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য সাধুপ্রবর রমানাথও মেলায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুই একদিন পরে নিঃসঙ্গী রমানাথ ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই জীবন, মৃত্যুর ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া রমানাথ যখন তাঁহার ত্যক্ত গৃহস্থালী ও জননীর স্নেহময় ক্রোড় স্মরণ করিয়া করুণ-আর্ত্তনাদে দিগন্ত মুখরিত করিতেছিলেন,তখন স্নেহময়ী জননীরই মত এক মহাপুরুষ আসিয়া হতভাগ্যকে আপনার অঙ্কে লইয়া বসিলেন। যে-সকল মহাপুরুষ কেবল সমাজের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত গোপনে লোক-সমাজে আবির্ভূত হইয়া আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধিমাত্র আবার নির্জ্জনে নিজের তপস্যায় মগ্ন থাকেন, ইনিও তাঁহাদেরই অন্যতম। রমানাথের বহুপুণ্যফলে তিনি এইরূপ মহাত্মার করুণাকটাক্ষে নিপতিত হইয়াছিলেন। সাধুর প্রাণান্ত চেষ্টায় যখন রমানাথ আরোগ্যলাভ করিলেন, তখন তিনি রমানাথকে কিছু অর্থ দিয়া বলিলেন, 'এইবার তুমি নিজস্থানে গমন কর।' রমানাথ তাঁহাকে অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "আপনার ও অর্থে আমার কোন প্রয়োজন নাই এবং আমার আর কোথাও যাইবারও স্থান নাই। আপনিই কৃপা করিয়া আমাকে জীবন দিয়াছেন, এখন আপনার চরণতলেই আমাকে স্থান দান করুন।" এই কথা বলিয়া রমানাথ সাধুর পায়ে পড়িলেন।

সেইদিন হইতে রমানাথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; পবিত্র সাধু-সঙ্গে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্পর্শ-মণি-স্পর্শে লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল।

ইহার চৌদ্দবৎসর পরে রমানাথ গুরুর আদেশে একবার দেশে আসিলেন। তখন তাঁহার দুঃখিনী জননী স্বর্গগতা; কিন্তু অভাগিনী পত্নী মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও শেষ সময়ে একবার স্বামীকে দেখিবার আশায় বহুকষ্টে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। পঞ্চদশ-বর্ষীয় পুত্র শিবেন মৃত্যুপথযাত্রী জননী ও সংসারের অন্নাভাবের চিন্তা লইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতেছে। এ হেন সময়ে রমানাথ আসিয়া উপস্থিত। অসময়ে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে স্বামীকে দেখিয়া সাধ্বী জীবনের সকল দুঃখ বিস্মৃত হইল; স্বামীর হস্তে অনাথ পুত্রকে সঁপিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া গেল, "ওগো আর একে ত্যাগ করো না।"

রমানাথ স্ত্রীর জীবিতকালে যে ব্যবহারই করুন, মৃত্যুর পরে আর তাহার কথার অন্যথা করিলেন না। স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলেই, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আবার সংসার-ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

রমানাথ নিজেই পুত্রকে শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন; উপস্থিত যোগশিক্ষা দিতেছিলেন। এই দীর্ঘকাল আর পুত্রকে সঙ্গ-ছাড়া করেন নাই। উপস্থিত পিতাপুত্রে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। নির্জ্জনতার জন্য শ্মশানের অতি-সন্নিকটে সামান্য একটি কুটিরমাত্র আশ্রয় করিয়া দুই জনে বাস করিতেছিলেন। লোকে জানিত, কোন দীন ভিক্ষুক এস্থানে আশ্রয় লইয়াছে।

সন্ধ্যা-বন্দনার পর শিবেন যখন পিতার নিকট কতকগুলি শাস্ত্রীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইতেছিল, তখন বাহিরে একটু ঝড় উঠিয়াছিল। ঝড়ের বেগ অল্প উঠিয়াই থামিয়া গেল; কিন্তু সেই সময় কুটিরের পশ্চাতে যেন শিশু-কণ্ঠের রোদন শোনা গেল; রমানাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই দুর্য্যোগের সময় শ্মশানে শিশু কাঁদে কেন? শিবেন দেখতো।"

ক্ষণ-পরেই শিবেন রোরুদ্যমানা সদ্যঃপ্রসূতা একটি কন্যাকে কোলে লইয়া কুটিরে প্রবেশ করিল। রমানাথ দেখিয়া বুঝিলেন, কোনও হতভাগিনী নিজের কলঙ্কভার গোপন করিবার জন্য এই নিরপরাধাকে এইরূপে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে! নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে রমানাথ বলিলেন, "হা ভগবন্ তোমার এ পবিত্র-ধামেও পাপের তাণ্ডবলীলার নিবৃত্তি নাই!" পরে তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শিবেন, আজ আমরা দু'জনে যা পারি এর সেবা করি, এস; কাল কোন আশ্রমে এর প্রতিপালনের ভার দিয়া আসিব।"

ঘরে দুধ ছিল। একটু খড় কুটার আগুন জ্বালিয়া উভয়ে শিশুর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তখনও উষা পূর্ব্বাকাশে স্পষ্ট দেখা দেয় নাই। শীতল বাতাস উষার আগমন ঘোষণা করিতেছে মাত্র। সেই সময় রমানাথ ও শিবেন ঘুমন্ত শিশুকে সাবধানে কুটিরে রক্ষা করিয়া প্রাতঃস্নানের জন্য বাহিরে আসিলেন। সেই মুহূর্ত্তে শ্মশান হইতে এক হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ আসিয়া তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা চকিতে চাহিয়া দেখিলেন কতকগুলি লোক কোন শবদেহ দগ্ধ করিতে আসিয়াছে; মৃতের কোন শোকার্ত্ত আত্মীয় মর্ম্মভেদী বিলাপে হাহাকার করিতেছেন।

রমানাথ সংসারত্যাগী বটে; সাধুও বটে। কিন্তু মানব-দেহে রক্তবিন্দুর সহিত মায়া গূঢ়-ভাবে মিশ্রিত। যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ মানব রক্ত-মাংস-গঠিত দেহও ত্যাগ করিতে পারে না, এবং দেহগত মায়ার হাতও এড়াইতে পারে না। জীবের দেহত্যাগ ও আত্মীয়ের বিলাপ নিত্য ঘটনা হইলেও শ্মশানের এই হাহাকার রমানাথের অন্তরে গিয়া আঘাত করিল। সজলচক্ষে করুণার্দ্র-হৃদয়ে রমানাথ সেইদিকে একটু অগ্রসর হইলেন।

গৃহে সরোজার সম্মুখে মণিমোহন নিজের যে তীব্রবেদনা সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন, শ্মশানে কোহিনুরের শত যত্নে শত মমত্বে গঠিত সেই কমনীয় দেহের উপর পড়িয়া সেই শোক কাতর-বিলাপে ব্যক্ত করিতেছিলেন। সে কি করুণ! কি মর্ম্মভেদী! জগতের মধ্যে একমাত্র সন্তান আজ বক্ষঃশূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে; চন্দ্রসূর্য্যে আলোকিত পৃথিবীকে চিরদিনের জন্য অন্ধকারে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে! নিষ্ঠুর পৃথিবী চিরদিন আলোকে হাসিবে, শোভায় সাজিবে, কিন্তু তাঁহাদের অন্ধকার তো আর ঘুচিবে না। জীবনভার আরও কত দীর্ঘ দিন বহিতে হইবে! কিন্তু এই মরু-ভূমে, এই স্নেহহীন সুখহীন উদ্দেশ্যহীন জগতে কি করিয়া সে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইবে; যাহারা চক্ষের জ্যোতি, হৃদয়ের আশা, জীবনের সর্ব্বস্ব, তাহারাই যদি চলিয়া গেল, তবে এ প্রাণ কেন যায় না? ওরে সন্তান, ওরে নিষ্ঠুর, সঙ্গে নে রে, সঙ্গে নে! ওরে পিতা-মাতার যে তোরাই সব!!

রমানাথের জ্ঞানদীপ্ত ধ্যানাভ্যস্ত চক্ষু পুনঃ পুনঃ অশ্রুসিক্ত হইতে লাগিল। একটু সান্ত্বনা-দানের ইচ্ছায় তিনি মণিমোহনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; মণিমোহন তখন কোহিনুরের মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া দুই হাতে সেই মুখ বেষ্টন করিয়া শত-আদরে তাহাকে আহ্বান করিতেছিলেন! রমানাথ সে মুখের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন; ভগবানের এই সুন্দর সৃষ্টি কি অকালেই বিসর্জ্জিত হইয়া গেল! কিন্তু ইহা তো আজ নূতন নয়; এ বিধি ত জগতে চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। রমানাথ মণিমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি আপনার কন্যা?" রোদনরক্ত চক্ষু তুলিয়া মণিমোহন উত্তর দিলেন, "হতভাগার একমাত্র সন্তান।" "বিধবা কি?" এই প্রশ্নে মণিমোহন নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "সে কথা আর কি বলিব বলুন? বার-বছরের ছেলে এনে, মানুষ করে, মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিই। আমার ইন্দ্রের মত জামাই তিন দিনের জ্বরে চ'লে গেল। আজ এক বৎসর সেই শোকে জীর্ণ হয়ে শুধু মেয়েটিকে বুকে ধরে ছিলাম। আজ আমার সে সম্বলও ঘুচে গেল!" মণিমোহন আবার কোহিনুরের মুখের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রমানাথ অনেক প্রকারে সান্ত্বনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আঘাত যখন লাগে তাহার বেদনা নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত কিছুতেই উপশম মানে না। যদি জ্ঞান বা উপদেশ বা তপঃ-প্রভাব সদ্যঃ সন্তানশোক প্রশমিত করিত, তাহা হইলে বশিষ্ঠ ঋষি পুত্রশোকে পাশবদ্ধ হইয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিয়া জীবন-ত্যাগে প্রয়াসী হইতেন না। সন্তানের মায়াও যেমন দুরতিক্রম্য, শোকও তেমনি দুর্দ্ধর্ষ।

এ-দিকে দাহকারিগণ চিতা প্রস্তুত করিয়া যখন শব লইতে আসিল, তখন মণিমোহনকে লইয়া ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইল; জ্ঞানশূন্য মণিমোহন প্রথমে তো কিছুতেই কন্যাকে ছাড়িবেন না! অনেক কষ্টে যখন কোহিনুরের দেহ ছাড়াইয়া লওয়া হইল, তখন তিনি নানারূপে নিজের জীবন-নাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দাহকারিগণ শবদাহ করে, কি মণিমোহনকে আটকায়? এদিকে বৃথা সময়-ক্ষেপ হইতে লাগিল। রমানাথ তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শেষে তিনি দাহকারিগণকে বলিলেন, "তোমরা ইঁহাকে লইয়া গৃহে যাও; এখানে আমরা পিতাপুত্রে আছি; দু'জনে শবের গতি করিব।" কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল। কোহিনুরকে ত্যাগ করিয়া মণিমোহন কিছুতে গৃহে ফিরিলেন না। তখন রমানাথ মণিমোহনকে বলিলেন, "আপনি যদি একটু স্থির হ'য়ে আমার কথা শুনিতে পারেন, তা হ'লে আমি আপনার হিতার্থেই একটি কথা বলি।" স্নেহান্ধ শোকার্ত্ত মণিমোহন বলিলেন, "কিন্তু আমি কন্যার দেহ ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। আপনার যাহা বলিবার এখানেই বলুন।"

রমানাথ বলিলেন, "আপনি কন্যার অনেক চিকিৎসা করাইয়াছেন, কিন্তু গুরুর কৃপায় আমিও কিছু চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়াছি। আপনারা কন্যাটিকে দগ্ধ করিতে আনিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার ধারণা এখনও ইহার দেহে জীবনীশক্তি আছে। যদি আমার হাতে বিশ্বাস করিয়া দেহটি সমর্পণ করিতে পারেন, আমি দুই দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।"

রমানাথের কথা শুনিয়া অপর সকলে হো

হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, "কি ঠাকুর! গাঁজায় ক'চিলিম দম চড়িয়েছ?" কেহ বলিল, "ওহে অঘোরী হবে হয় তো! মড়াটা খাবার চেষ্টায় আছে!" কেহ বা বলিল, "শ্মশানে থেকে শিবত্ব লাভ করেছেন কি-না, সুন্দরী মৃতা কন্যা স্কন্ধে ক'রে নাচ্‌বার সখ হয়েছে বুঝি!"

রমানাথ কোন কথায় মনোযোগ না করিয়া মণিমোহনের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মণিমোহন কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনি কি এই কথা সত্যি বল্‌ছেন? আমাদের দুরদৃষ্টের মত আপনিও আমায় বঞ্চনা করছেন না তো?"

"র। আমার ধারণা-মত প্রকৃত কথাই বল্‌ছি; তবে বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা। দু'দিন আমি চেষ্টা করব, তৃতীয় দিন উষাকালে এই শ্মশানে এলেই আমি আপনার কন্যা প্রত্যর্পণ করব। কৃতকার্য্য হ'তে পারি ভালই; না পারি, আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, দেহের কোন অনিষ্ট হবে না; ঠিক এই-ভাবে ফিরে পাবেন।

মণিমোহন তখন রমানাথের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। রমানাথ হাত ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া বলিলেন, "আমায় অপরাধী করিবেন না। আমি কাহারও প্রণাম লইবার পাত্র নই। তাহা ছাড়া আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-লাভের এখনও তো কিছু করি নাই। যদি ঈশ্বর আপনাকে জীবিত কন্যা দান করেন, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবেন।"

মণিমোহন তখন অপর লোকের সাহায্যে কোহিনুরের দেহ কুটীরের মধ্যে লইয়া রাখিলেন এবং বারংবার রমানাথের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া লোকজন-সহ প্রস্থান করিলেন।

শিবেন বলিলেন, "বাবা, সত্যই কি দেহে এখনও প্রাণ আছে?"

রমানাথ উত্তর দিলেন, "বহুক্ষণ প্রাণত্যাগ হইয়াছে।" শিবেন প্রশ্ন করিল, তবে আপনি কি করিয়া বাঁচাইবেন?"

"এতদিন শিবেন, মুখে মুখে যাহা তোমায় শিখাইয়াছিলাম, আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইব। ওই ক্ষুদ্রবালিকার আত্মা এই দেহে প্রবেশ করাইব।"

১০

মণিমোহন শ্মশান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। সরোজা কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের গোড়ায় আছাড় খাইয়া পড়িল ও বলিল,—"ওগো আমার মাকে কোথায় রেখে এলে? এনে দাও গো একবার! আমার হারাধন এনে দাও!" কাতর-ক্রন্দনে সরোজা স্বামীর চরণ সিক্ত করিতে লাগিল। দুই হাতে সরোজার মুখ তুলিয়া ধরিয়া মণিমোহন বুঝাইতে লাগিলেন,—"স্থির হও, একটু স্থির হও; তোমার সঙ্গে আমার গুরুতর কথা আছে।" সরোজা তখনও কাঁদিতে লাগিলেন,—"আর আমার কোন কথার প্রয়োজন নেই; সংসারের আমার আজ সব শেষ হয়ে গেছে। আমি সুশীলকে হারিয়েও যাকে নিয়ে সব ভুলে ছিলাম, আমার সে মাণিক আজ কে কেড়ে নিলে? ওগো আমায় কোহিনুরের কাছে দিয়ে এস! আমি শুধু তাকে কোলে নিয়ে সব জ্বালা ভুলি।" মণিমোহন নিরুপায়ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুমি একটু স্থির হবে না? এমনি করে কাঁদলে কি তাকে পাবে? আমি তাকে পাবারই কথা বল্‌ছি। উঠে ঘরে চল দেখি!"

সরোজার মনে হইল স্বামী বুঝি এক সঙ্গে দুই জনের মরণের অভিসন্ধি করিয়াছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল্‌বে?' মণিমোহন "দূরে এস বল্‌ছি" বলিলে সরোজা কম্পিত-চরণে স্বামীর পশ্চাৎ গৃহে প্রবেশ করিল। মণিমোহন বলিলেন, 'সরোজা, আমার কোহিনুর এখনও মরে নি।' অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে সরোজা বলিল, "কই তবে সে? অ্যাঁ, আমার মা কই?" মণিমোহন বলিলেন, "শোন, অত অস্থির হলে কি চলে? শ্মশানের একটু দূরে একখানি ছোট কুঁড়ে বেঁধে একটি মাহাত্মা বাসা নিয়েছেন। তাঁকে দেখ্‌লে অসাধারণ বলে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু অন্তরে তিনি দেবতাবিশেষ। তিনি আমার কোহিনুরের দেহ পরীক্ষার জন্য নিয়ে গেছেন; বলেছেন, তৃতীয় দিন উষাকালে তাঁর দ্বারে উপস্থিত হ'তে হবে। যদি ভগবান্ করেন, সে-দিন আমরা হারানিধি ফিরে পেলেও পেতে পারি। আর নিতান্ত যদি ভাগ্য বিরূপ হয়, তবে তার মৃত দেহই ফিরে পাব। সরোজা, আর দুটো দিন কেঁদ না; একটু ধৈর্য্য ধরে থাক। কাঁদ্‌বার সময় এর পর তো অনেক দিন আছে।'

বিস্মিতা স্তম্ভিতা সরোজার কিছুক্ষণ বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। শেষে সে দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া অঙ্গনের তুলসীমূলে পড়িল। সেদিন সেখান হইতে কেহই আর তাহাকে উঠাইতে পারিল না।

তৃতীয় দিনে উষাগমের বহু পূর্ব্বেই মণি-মোহন ও সরোজা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মণিমোহন সরোজাকে তাঁহার সহিত আসিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি কোহিনুরকে জীবিত না পাই, তাহা হইলে তুমি কি ধৈর্য্য ধরিতে পারিবে? তোমার গিয়া কাজ নাই। তাহাকে যদি ফিরাইয়া আনিতে পারি, তুমি তো দু'দণ্ড পরে গৃহে বসিয়াই তাহাকে দেখিবে।" সরোজা কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল, "না না; আমায় নিয়ে চল; আমার মনের সে ধৈর্য্য আছে, ভাব! আর যদি মাকে আর-না পাই, তবু তো একবার সে-মুখখানি দেখ্‌ব। ওগো আমি যে আজ তিন দিন তাকে দেখি নি।" অগত্যা মণিমোহন স্ত্রীকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন।

যতই তাঁহারা শ্মশানের নিকটবর্ত্তী হন, ততই হৃদয় উৎকণ্ঠায় আকুল হইতে থাকে। এদুই দিন মনে অনবরত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলিলেও, তবু চিরন্তন-রীতি-অনুসারে আশাই মনে স্থান লাভ করিয়াছে। অমন মহাপুরুষ, যিনি স্বেচ্ছায় তাহার চিকিৎসার ভার লইলেন, তিনি কি জীবনের আশা না বুঝিয়াই এমন কথা বলি-লেন? এ তো নূতন বা আশ্চর্য্য কিছুই নয়। শ্মশানে লইয়া গিয়া দেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে, এমন ঘটনা কত শোনা গিয়াছে। এ তো তাহার উপর একজন সাধু আশ্বাস দিতেছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে যথার্থই মৃতকে সঞ্জীবিত করিতে পারেন!

কিন্তু আজ সেই সময়ের পলে পলে যত অবসান হইতে লাগিল, আশার ধীরে ধীরে তত অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল। রমানাথ ভাবিতে লাগিলেন, 'কি দেখিব! হয় তো সেখানে কুটির বা কুটিরস্বামী কেহই নাই! শোকাচ্ছন্ন মোহান্ধ পিতার বক্ষ হইতে মৃতকন্যার দেহ অপসৃত করিবার কৌশল-মাত্র প্রদর্শন করিয়া যাদুকরের মত তিনি কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। নতুবা হয় তো কুটির-দ্বারে কঠিন ভূমির উপর কোহিনুরের কোমল

স্নেহলতা নিঃক্ষেপ করিয়া পিতাপুত্র অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আমাকে হেলায় অঙ্গুলী হেলন করিয়া বলিবে, "ওই তোমার কন্যার দেহ পড়িয়া আছে, লইয়া যাও।" যদি তাই দেখিতে হয়, তবে দু'দিন এ বৃথা আশায় আশান্বিত হইয়া আবার নূতন করিয়া এ শেলাঘাতের কি প্রয়োজন ছিল? সাধুর হয় তো ইহা সামান্য কৌতূহল-নিবৃত্তিমাত্র, কিন্তু শোকজর্জ্জর পিতামাতার হৃদয়ে উহা যে কঠিন কুলিশাঘাত! সে কে বুঝিবে?' আজ সঙ্গে কোন অপর লোক আসে নাই। সে-দিন যে শ্মশানে বহুলোকেও মণিমোহনকে সামলাইতে পারে নাই, আজ মণিমোহন একাকী সেই ভয়ঙ্কর স্থানে শোকাহতা সরোজাকে কি করিয়া স্থির রাখিবেন? তাহার উপর সেই অভাগিনীর সৎকার আছে। মণিমোহন ভাবিতে লাগিলেন, অতি-নির্বুদ্ধিতার কাজ হইয়া গিয়াছে। তিনি কি বলিয়া যে তখন এই অসম্ভব প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন; বুঝিলেন, শোকে এইরূপই লোকে উন্মত্ত হইয়া যায়।

সরোজা সহসা চিন্তামগ্ন স্বামীর গাত্রে করস্পর্শ করিয়া বলিল, "দেখ, ওই কি সে কুটির দেখা যাচ্চে? দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে না?" দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মণিমোহন বলিলেন, "ওই বটে! যা ভাবিয়াছি তাই! সরোজা, মনকে দৃঢ় কর। উঁহাদেরই চরণতলে ভূমিতে তোমার হৃদয়ের ধনকে লুণ্ঠিত দেখিবে।" ব্যাকুলভাবে সরোজা বলিল, "আগে থাক্‌তেই ও-কথা কেন বল্‌ছ? হয় তো ওইখানে আমার কোহিনুরও আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েআছে।" দুঃখের হাসি হাসিয়া মণিমোহন বলিলেন, "ঠিক এমনি বুদ্ধিতেই আমিও মজিয়াছিলাম। সরোজা শোকে অন্ধ। ইহা নূতন নয়।—তুমি দুইজনকে দেখিতে পাইতেছ, তবে কেমন করিয়া ভাবিতেছ, ওখানে কোহিনুরও অছে?—" স্বামীকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া সরোজা বক্ষে মুখ লুকাইল; বলিল, "তবে আমি আর যাব না, তুমি এইখানে আমার মাকে এনে আমার কোলে দাও; আমি শেষ দেখা দেখি।" মণিমোহন বলিলেন, "তবে স্থির হয়ে ব'স, আর তোমার পা চল্‌বে না, তা আমি জানি। আমি তাকে নিয়ে আসি। তুমি যেন উঠ্‌তে চেষ্টা ক'র না।" সরোজ একবারে শ্মশানের উপর লুটাইয়া পড়িল। মণিমোহন কুটিরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতেই রমানাথের কণ্ঠস্বর মণিমোহনের কর্ণে প্রবেশ করিল—"ওই যে এসেছেন! মা, ওই দেখ, তোমার পিতা! যাও প্রণাম কর গে।" মণিমোহন ত্বরিত-দৃষ্টিতে চাহিবামাত্র সম্মুখে কোহিনুরের হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; ছুটিয়া গিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া কন্যাকে বক্ষে ধরিলেন। পিতা-পুত্রীর আনন্দ-মিলন দেখিয়া রমানাথের চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

প্রথম উচ্ছ্বাস একটু শমিত হইলে মণিমোহন গিয়া রমানাথের চরণ-বন্দনা করিলেন; দুই-হাতে চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো শত-অপরাধী দাসকে মার্জ্জনা করুন। আমি কত সন্দেহ, কত কুচিন্তায় আপনাকে অপমানিত করিয়াছি, বলিতে পারি না। আমি যে সত্যই কন্যাকে ফিরিয়া পাইব, আজ সে আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার সে

মহাপাপের দণ্ড দান করুন।" রমানাথ হাত ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া বলিলেন "কোন চিন্তা নাই; আপনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা মানব-স্বভাবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ফল না দেখিয়াই যদি সকল কাজে বিশ্বাস-স্থাপন করা যাইত, তাহা হইলে মানবের জ্ঞান কখনও স্ফূর্ত্তি পাইত না। ও-সব কথা ত্যাগ করুন। আপনার সঙ্গী কে ছিলেন না?" মণিমোহন কহিলেন, "আজ্ঞে আমার স্ত্রী ছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে মৃতা কন্যা দেখাইবার জন্য আর এত দূর বৃথা টানিয়া আনি নাই। সে ওই যমুনার ধারে বালির উপর শুইয়া আছে।"

রমানাথ ডাকিলেন—"শিবেন!" কুটির হইতে বাহির হইয়া শিবেন পিতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রমানাথ বলিলেন, "মা-কে ওঁর গর্ভধারিণীর কাছে লইয়া যাও। আমি মণি-মোহনকে দুইটা কথা বলিব।" কোহিনুর শিবেনের সহিত চলিয়া গেল।

রমানাথ বলিলেন, "আমি অপনার কন্যা ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধিতে ঠিক আপনার সেই কন্যাটিই আমি দিতে পারি নাই। আমার সামর্থ্য অতিসামান্য। কোন মহানুভব ব্যক্তি এ-কাজ করিলে আপনার যেমন কন্যা ছিল, তেমনিই পাইতে পারিতেন। কিন্তু আমি যাহাকে অপনার নিকট ফিরাইয়া দিলাম, ইহাতে আপনার পূর্ব্ব কন্যার অন্য সকল গুণ বর্ত্তমান থাকিবে বটে, কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইবে। গত জীবনের সুখ বা দুঃখ কোন কথাই ইহার স্মরণ থাকিবে না, তবে পূর্ব্ব ঘটনাবলী অনবরত আলোচনা করিতে করিতে বহুদিনের পর ধীরে ধীরে সে-স্মৃতি পরিস্ফুট হইতে পারিবে। আপনার কাছে আমার ভিক্ষা, আমার এ ত্রুটিটুকু মার্জ্জনা করুন।"

"দাসকে এ কি কথা প্রভু! আমায় এমনি করিয়া কি দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?" বলিয়া মণিমোহন আবার চরণ-বন্দনা করিয়া বলিলেন, "যদি এত অনুগ্রহ করিলেন, তবে আর একটু করুন; আমায় আপনার শিষ্যত্ব দান করিয়া কৃতার্থ করুন।"

রমানাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনার সে সময়ের আরও কিছু বিলম্ব আছে। আচ্ছা, আমি কথা দিলাম, উপযুক্ত সময়ে আমি উপস্থিত হইয়া আপনাকে শিষ্য-রূপে গ্রহণ করিব। আপনি আর বিলম্ব করিবেন না। আমরাও এই প্রভাতেই আজ এ-স্থান ত্যাগ করিব।"

মণিমোহন আবার প্রণত হইলেন। রমা-নাথ মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মণিমোহন যখন স্ত্রী ও কন্যার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন হর্ষে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল, চক্ষে পুলকাশ্রু সঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, সরোজা বারংবার তনয়ার মুখ-চুম্বন করিয়া ডাকিতেছেন, 'কোহিনুর, কোহি-নুর!' আর কোহিনুর দুই-হাতে মায়ের কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া উত্তর দিতেছে—'মা' 'মা'!

(ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

আরতি।

মল্লার—তেওরা।

(১)

এ কি এ আরতি গগনে!—
হেম-মণ্ডিত মন্দির মাঝে
সন্ধ্যা-ধূসর লগনে!
গরজে দামামা জলদ-মন্দ্রে,
বজ্র নিনাদে রন্ধ্রে রন্ধ্রে;
ভীম গম্ভীরে দূর অম্বরে
ঘোর ঘন-ঘটা সঘনে!—
কাহার আরতি গগনে!

(২)

পঞ্চপ্রদীপ জ্বালায়ে বিজলী
নাচিয়া নাচিয়া পড়িছে উছলি,
ধূপ-গুগ্‌গুলে ঘন ঢেউ তুলে
মেঘেরা ধূম্র বরণে!—
কে গো আনন্দ ছন্দে গলিয়া
চন্দ্রমা-দীপ দিয়েছে জ্বালিয়া;
তারা-ফুলগুলি ঢলিয়া ঢলিয়া
লুটাইছে চারু চরণে;—
কাহার আরতি গগনে!

(৩)

কে গো সিঞ্চিয়া শান্তি-সলিল
আরতির শেষে ভাসায় নিখিল!—
ধরণী সে বারি ধ'রে তিল তিল
মাখিয়াছে সারা জীবনে!—

(৪)

হাসে তরুলতা, হাসে ফুলফল,
নাচে ষড়্‌ঋতু হইয়া সফল;
সাগর-তটিনী বহে কল কল্
সজল সে ধারা মগনে!
কাহার আরতি গগনে!

রচনা—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

৩ ১´ ২ ৩ ১´
II [র্মা মা I রা মা রা। সা -া। ন্‌া সা I (রা -মা -া।
এ কি এ আ র তি ০ গ গ নে ০ ০

২ ১´ ২ ৩ ১
। -রা -া)]। রা -মা -া। -পা -মা। -রা -সা I মা -া মা।
০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ হে ০ ম

২ ৩ ১´ ২ ৩
। পা -া। ধা পা I র্মা -া পা। না -র্সা। র্সা র্সা I
ম ণ্ ডি ত ম ন্ দি র ০ মা ঝে

৩　　　১´　　　　　২　　　　৩　　　　১´
। -পা　পা I মা　-া　পা । র্সা　-া । পধা　পা I পা　মা　রা ।
০　রা　ম　০　গ　নে　০　কা০　হা　র　আ　র

২　　　৩　　　১´　　　　　২　　　　৩
। সা　-া । না　সা I রা　-মা　-পা । -মা　-রা । মা　মা II II
ভি　০　গ　গ　নে　০　০　০　০　"এ　কি"

আমার বিবাহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুড়ি দিন কাটিয়া গেল। বাবা মা, সরযু ও ললিতকে লইয়া কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাছার মেসে খেয়ে সুবিধা হ'ত না, তাই রোগা হয়ে গিয়েছে!" বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি এর মধ্যে অসুখ হয়েছিল? এরূপ চেহারা খারাপ হ'ল কিসে?"

আমি "না, আমার কোন অসুখ হয় নাই," বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সরিয়া গেলাম।

বাবা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন যে, পরীক্ষার পরেই আমার বিবাহ দিবেন। তাই তিনি নানা স্থানে পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু মায়ের নিকট বার বার বলিয়া আসিতেছিলাম যে, আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না।

আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, অমিয়ার সহিত যদি বিবাহ হয়, তবেই বিবাহ করিব; তাহা না হইলে এ-জীবনে আর বিবাহই করিব না। আমি এটি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায়, তাহাকে ছাড়া অন্য আর কাহাকেও সেরূপ ভালবাসা যায় না। এ জগতে যাহাদিগকে এইরূপ ভালবাসার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়, তাহাদিগের হৃদয় কিরূপ, জানি না। যে পুরুষ তাহার প্রথম পরিণীতা বধুর নিকট দিবানিশি বলিয়া আসিয়াছে যে, জগতে তাহাকে ছাড়া তাহার ভালবাসিবার আর কিছুই নাই, সে যদি সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পরই পুনরায় দার-পরিগ্রহ করে, এবং এই বধূকেও সেই কথাই বলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কপটতামাত্র কি না তাহা সকলের বিবেচ্য। অমিয়ার প্রতি আমার ভালবাসা স্বচ্ছ বারিধির ন্যায় নির্ম্মল ও গভীর। তাই আমি তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করার কথা একেবারে মনে স্থান দিতেই পারি নাই।

বাবা এ-দিকে একটি পাত্রী পছন্দ করিয়া আমার বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। এ-কথা শুনিয়া আমার যে কিরূপ দুঃখ ও রাগ হইয়াছিল, তাহা দু'এক কথায় বর্ণনা করা যায় না। আমি সেই-দিনই রাত্রিতে মাকে

বলিলাম যে, তাঁহারা যদি আমার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন্, তাহা হইলে আমি নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইব। এ-কথাতে মাতা কত অশ্রুপাত করিলেন, কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই আমাকে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত করাইতে পারিলেন না। মা মনে ব্যথা পাইয়াছেন, জানিয়া মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

পরদিন বাবা আমার বাল্যবন্ধু পরেশকে ডাকাইয়া আমার এইরূপ বৈরাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাইলেন, কিন্তু সেও সন্তোষজনক কোন কারণ দেখাইতে পারিল না। কারণ, আমার মনের কথা আমি এতদিন কাহাকেও বলি নাই। সে-দিন হইতে পরেশ আমার পিছু লাগিল। প্রতিদিন আমাকে সে বিরক্ত করিতে লাগিল। পাছে কোন দিন অন্য বন্ধুর সাম্‌নে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, এই ভয়ে একদিন আমি তাহাকে নানাপ্রকার প্রতিজ্ঞা করাইয়া সমস্ত কথা বলিলাম। পরেশ আমার কথা শেষ হইলে খুব খানিকটা ভীষণভাবে হাসিল এবং পরে বলিল, "আচ্ছা এর প্রতিকার হচ্ছে!" আমি ভাবিলাম, পরেশ নিশ্চয়ই তাহা হইলে এ-কথা প্রকাশ করিবে। ইহাতে ভয় হইল। আমি তাহার পায়ে পড়িলাম এবং বলিলাম, "দেখ পরেশ, যদি তুমি এ-কথা প্রকাশ কর, তাহা হইলে চিরদিনের তরে আর আমি তোমার মুখ দেখিব না।" সে কিছুতেই কাহাকে বলিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, কিন্তু পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে বুঝিলাম যে সে তাহার প্রতিজ্ঞা রাখে নাই।

দিন-কতক সকলকেই বেশ চুপ্ চাপ্ দেখিয়া আমি ভাবিলাম, পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া এ-সময়ে বাবা কিংবা মা আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে ইচ্ছুক নন্। কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পর সরকারী উদ্যান হইতে বেড়াইয়া আসিয়া দেখি যে, বাহিরকার ঘরে আমার বিছানার উপর রামদুলালবাবু বসিয়া আছেন এবং বাবা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর একখানি কাগজে কি লিখিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই রামদুলালবাবু বলিলেন, "কিহে সতীশ, কেমন আছ?"

একে রামদুলালবাবুর হঠাৎ আগমন, তাহাতে আবার আমাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন! আমার ত শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। আমার মনে হইল, "তবে কি পরেশ আমার কথা বাবা কিংবা মা'র নিকট প্রকাশ করিয়াছে?" এ-কথা মনে হইতেই লজ্জা এবং পরেশের প্রতি রাগ, এই দুইটিই একসঙ্গে আসিয়া আমার মনকে আক্রমণ করিল; এবং একটু যে আনন্দ তাহার সহিত একেবারে যোগ দিল না, তাহা নহে। দিনকতক আমি মুখ তুলিয়া মা কিংবা বাবার সহিত কথা বলিতেই পারিলাম না। পরেশের প্রতি তখন ক্রুদ্ধ হইলেও এখন দেখিতেছি পরেশই আমার প্রকৃত বন্ধু।

পরীক্ষার দিন-কতক পূর্ব্বে শুনিলাম যে, আমার বিবাহের ঠিক হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষা যে-দিন শেষ হইবে, তাহার চারি দিন পরেই আমার বিবাহ। একেবারে যদি কোন আপত্তি না করি, তাহা হইলে মায়েরাই বা কি মনে করিবেন, এজন্য এবারেও কিঞ্চিৎ নরমভাবে আপত্তি করিলাম। কিন্তু সে আপত্তি যে কিছুই নহে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল, বিবাহের দিনও আসিয়া উপস্থিত হইল। রামদুলালবাবু পূর্ব্বেই কলিকাতায় একখানি বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহারাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণ-পর্য্যন্ত ভয় হইতেছিল—"যদি এ অমিয়া না হয়, তাহা হইলে কি হইবে?" কিন্তু শুভ-দৃষ্টির সময় সে-সন্দেহ দূর হইল। সম্মুখে দেখিলাম, অমিয়ার সেই পরিচিত লজ্জানম্র মুখখানি যেন আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যার সময় অমিয়াকে বলিলাম, "দেখ অমিয়া, এখন থেকে তোমাকে আর 'আপনি' বলিব না, 'তুমি' বলিব।" এ কথার উত্তর অমিয়া কিছুই দিল না। সেই মুহূর্ত্তে পরেশ আসিয়া উপস্থিত। পরেশকে দেখিয়া অমিয়া পলাইবার আয়োজন করিতেছিল। তাহাকে বাধা দিয়া পরেশ বলিল, "দেখুন, বৌ-ঠান, আপনাকে একটা কথা বলি। এই যে সতীশ-ছোক্‌রাকে দেখ্‌তেছেন, ইনি—আমি উঁহার আপনার সহিত বিবাহের আয়োজন করিয়া দিয়াছি বলিয়া—চিরকালের জন্য আমার মুখ দেখিবেন না, সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহা কি আপনি অনুমোদন করেন?" অমিয়া পরেশকে কোন উত্তর দিল না। আমার একবার মনে হইল, যেন সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আমি বলিলাম, "দেখ পরেশ, ও-কথার আলোচনা করিয়া আর বৃথা কেন কষ্ট পাও?" পরে অমিয়ার হাত ধরিয়া আমি বলিলাম, "অমিয়া! আমি যে তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, পরেশই তাহার একমাত্র কারণ; সুতরাং আমাদের উভয়েরই উহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।" পরেশ বলিল, "তোমরা পরস্পরের নিকট এখন কৃতজ্ঞতা কিংবা আরও কোন উচ্চ অঙ্গের ভাব প্রকাশ করিতে থাক। আমি আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা চাহিয়া চলিলাম!" এই বলিয়া সে অমিয়ার হাতে একটি কৌটা দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। পরেশ চলিয়া যাইলে কৌটাটি খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে দুইটী আংটী রহিয়াছে। একটীতে অমিয়ার নাম লেখা, ও অপরটীতে আমার নাম লেখা।

ক্রীড়াপুত্তলী।

'আমার' 'আমার' করি' ভাবে শুধু মূঢ় মন,
কিন্তু হায়! কোথায় আমার।
ক্রীড়ার পুতুল তব আমার হৃদয় ল'য়ে
লীলাময়! খেল অনিবার!

কখনও শিশুর মত সাজাইয়া রাখ তারে
আপনার চরণের তলে,
কখনও পিশাচ-বেশ পরাইয়া রাখ দূরে,
যেন অতি-অনাদর-ছলে!

কখনও রাখহ তারে পবিত্র আসনে তব
কুসুমের কোমলতা দিয়া,
নির্ম্মম পাষাণে বাঁধি' কখনও বা তারে যেন
অবজ্ঞায় দাও সরাইয়া!

আপনার জ্যোতিঃ দিয়া কভু বা স্নেহের ভরে
বিমণ্ডিত কর তুমি তায় ;
আবার কালিমা ঘন মাখাইয়া কর দূর
না রহিতে তব সীমানায়।

কভু বা লীলার ছলে উড়াইয়া দাও তারে
অতি ঊর্দ্ধ আকাশের পানে,
হের উচ্চে উঠি' কিবা তোমারে ভুলিতে চায়,
মত্ত হ'য় আপনার জ্ঞানে।

আপন মোহের বশে আপনি চলিতে যায়
তোমার শকতি ফেলি' দূরে,
কিন্তু তোমা' ছাড়ি' সে যে হারা'য়ে আপন বল
নেমে পড়ে কোন্ নিম্নপুরে।

সেথা দেখে অন্ধকার—শুধু ঘোর অন্ধকার।
অসহায় নাহি আলম্বন!
শান্তি-হারা রুদ্ধশ্বাসে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদি'
স্মরে পুনঃ তোমার চরণ।

তুমিও কৌতুক-ভরে পুতুলের রঙ্গ দেখি'
তুল তারে হ'তে নিম্নস্তর ;—
যেন সকরুণ প্রাণে তাহার বেদনা বুঝি'
আপনার বুকের উপর।

ক্রীড়ার পুতুল তব এ জড় হৃদয় মম
তোমার শকতি ল'য়ে চলে,
খেলাও, সে খেলে তাই, তবুও কি ভ্রান্তি-বশে
'আমার' 'আমার' শুধু বলে।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ভারতীয় সঙ্গীত।

সঙ্গীত মানব-জাতির পরম আদরের সামগ্রী। পৃথিবীর সুসভ্য অসভ্য সর্ব্ব-জাতির মধ্যেই সঙ্গীতের সমাদর পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান কালের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশে—কি ভারতভূমে, কি মিশরে, কি গ্রীসে—কি রোমে, সর্ব্বত্রই সঙ্গীত অতিশয় উচ্চ আসন পাইয়াছে। শুধু তাহাই নয় যখন কোন বিজ্ঞান, পুরাণ, দর্শন, শিল্প বা গণিত, কিছুই মানুষের মস্তিকে উদ্ভূত হয় নাই, তখন বা তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতে সঙ্গীত মানব-জাতির হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কেন না, সঙ্গীত মানবের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি ; তাহার প্রকৃতির অন্যতম উপাদান। এইজন্য স্বভাবতই উহা তাহার মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

মনোভাব প্রকাশে বা তাহার পরস্পর আদান-প্রদানের উপায়ভূত ভাষা-সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে সঙ্গীত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শিশু প্রথম ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে রোদন করিয়া থাকে, উহাও সঙ্গীতের এক রূপ। তাহার রোদন, অস্ফুট ভাষণ, হসন, চলন, সমস্তই একই সঙ্গীতের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। মানুষের ভাষা এই অনন্ত সঙ্গীতের এক আকার-ভেদমাত্র। কিন্তু সঙ্গীত মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তি হইলেও সমস্ত দেশে, সমস্ত জাতির মধ্যে ইহা সমানভাবে বিকাশ লাভ করে নাই। পাত্রভেদে ইহা নানাস্থানে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষে

এই সঙ্গীত-বিদ্যা কি মূর্ত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

অতিপ্রাচীন কাল হইতে হিন্দুজাতি সঙ্গীত-বিদ্যা অতিযত্নের সহিত অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ ভারতে সঙ্গীত-বিদ্যা এতই প্রাচীন যে কোনও ব্যক্তি-বিশেষ ইহার প্রবর্ত্তক না থাকায় ইহাকে দেবতা-সম্ভূত বলিয়া মনে করা হয়।—মানবের আদিগান সামগান এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে প্রথম গীত হয়। হিন্দুমাত্রেই বেদকে নিত্য ও অপৌরুষের বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং সঙ্গীত-বিদ্যাকেও হিন্দুরা দেবসম্ভূত ও অনন্ত বলিয়া বিবেচনা করেন।

সঙ্গীত-কলার উৎপত্তি-বিষয়ে আমাদের দেশে কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রচলন আছে। সেগুলি সকলে সমান ভাবে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও হিন্দু-সঙ্গীতের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে অনেক মনীষীরই মতের ঐক্য দেখা যায়। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ঐকান্তিক সাধনার ফলে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হওয়ায়, ইহা মানুষেরই সাধন-লব্ধ ধন বলিয়া সহজে প্রত্যয় হয় না।

যাহা হউক, ভারতীয় সঙ্গীতের উদ্ভব নর-লোক বা দেবলোক যাহা হইতেই হউক, ইহা যে এক অতুলনীয় অমূল্য সম্পদ, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সঙ্গীতে হিন্দু-সভ্যতার আকৃতি, প্রকৃতি ও বিশেষত্ব অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধির সর্ব্বগ্রাহিতা, বিস্তার, ব্যাপকতা ও উদারতা এবং ভাবের আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি যে সমুদয় গুণাবলি তাহার সভ্যতাকে এত মহিম-মণ্ডিত করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই এই সঙ্গীত-চর্চ্চায় সবিশেষরূপে অভিব্যক্ত।

প্রথমতঃ হিন্দু স্বর বা নাদকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। তাহার শাস্ত্র, তাহার দর্শন তাহাকে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। ব্রহ্মই যদি জগৎ-কারণ হন্, আর সেই জগৎ-কারণ যদি স্বরাত্মক হয়, তাহা হইলে স্বর বা সঙ্গীতই জগৎ-কারণ। কারণের গুণ কার্য্যে বর্ত্তিয়া থাকে। সুতরাং এই সৃষ্ট প্রকৃতিও সঙ্গীতময়। ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সঙ্গীতও তদ্রূপ; কেন না, উভয়ই এক,—অভিন্ন। কেবল সঙ্গীতে "রসো বৈ সঃ" অনন্ত মাধুর্য্যময় রসরূপী ব্রহ্মের নিবিড় আনন্দ-রসের অনুধাবন ও আস্বাদন। এই অনন্ত অফুরন্ত মধু-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র উপভোগেই চরাচরের চরম ও পরম লাভ। তাই উপনিষদ্ বলিতেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্ত্যানন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" অর্থাৎ আনন্দ হইতেই ভূত-সকল জন্মিতেছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকিতেছে এবং অন্তিম কালেও আনন্দেতেই প্রবিষ্ট বা লীন হইতেছে।

একমাত্র ভারতবর্ষে ব্যতীত কুত্রাপি সঙ্গীতের এত উন্নত উদার কল্পনা সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই সাধক বলিয়াছেন—'গানাৎ পরতরং নহি'। পক্ষান্তরে সঙ্গীতরস-রসিক পাশ্চাত্ত্য কবি বলিলেন, "Eloquence the Soul, Song charms the sense." এই দুইটি সম্পূর্ণ-বিরুদ্ধ-ভাব-বিশিষ্ট উক্তি হইতেই দুইটি জাতির মানসিক প্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একজন আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে সমারূঢ়। তিনি সঙ্গীতে ভূমানন্দই

পাইয়া থাকেন ; আর একজন জড়বাদের নিম্ন স্তরে অবস্থিত। তিনি সঙ্গীতে ইন্দ্রিয়-সম্মোহনের অতিরিক্ত কিছুই প্রাপ্ত হ'ন না।

কেবল তাহাই নয়, কোনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সঙ্গীত-কলাকে "সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প-বিরক্তিকর শব্দ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "Music is the best disagreeable of all noise." পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতি সঙ্গীতময়ী। প্রকৃতির অশেষ কার্য্যাবলী সেই অনন্ত সঙ্গীতের সুরলয়ে ঝঙ্কৃত ও নিয়ন্ত্রিত। পাশ্চাত্ত্য নরদেবতাগণের কেহ কেহ ইহার আভাস পাইলেও তাঁহারা উহা সম্পূর্ণ অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। তাই কেহ বলিলেন, 'There is not the smallest orb which thou beholdest but in its motion like an angel sings'. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, যতক্ষণ আমাদের এই বিনাশশীল জড়দেহ থাকিবে, ততক্ষণ ইহার অনুভব সম্ভবপর নহে। অপর কবি বলিলেন যে, এই সঙ্গীত আমাদের সাধারণ স্থূল অসংস্কৃত শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে (Gross unpured ears. এই অনন্ত অসীম অখণ্ড এক সঙ্গীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাগরাগিণীতে সীমাবদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। তাই হিন্দু সঙ্গীতে ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণীর সৃষ্টি ও তাহাদের পরস্পরের সংযোগে ও সংমিশ্রণে অসংখ্য রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। এবং মিঞা তান সেন, বাইজু, বাহড়া, নানক প্রভৃতি সঙ্গীতের উপাধ্যায়গণ নানা প্রকার নূতন নূতন রূপের কল্পনা করিয়া নূতন নূতন রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছেন ; যথা দরবারী কানেড়া, পিলু, ইমন ইত্যাদি। প্রকৃতই হিন্দুগণ যে এই অসংখ্য মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া অসংখ্য রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের রসবত্তা ও সঙ্গীত-সাধনার পরাকাষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

অনন্ত অসীম বস্তু চিরকালই সীমা ও অন্তের গণ্ডির ভিতর আসিয়া পুনরায় অনন্তের ও অসীমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই যে সান্ত ও অনন্ত, সসীম ও অসীমের অবিরত মিশামিশি, ইহা হইতেই যাবতীয় সৃষ্টিপর্য্যায়। তাই কবি বলিয়াছেন—

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'—

এই কবিতাটিতে কবি প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। অসীম অনন্ত যেমন আপনাতেই আপনি পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাকেই সীমার গণ্ডীর মধ্যে ধরা দিতে চায়, সান্ত ও সসীমও সেইরূপ নিজের গণ্ডী ছাড়িয়া অনন্ত ও অসীমের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

অখণ্ড অনন্ত গন্ধরাশি আপনাতেই আপনি তৃপ্ত নহে। তাই সে ধূপ ফুল ফল লতা পাতা প্রভৃতিতে আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে।

তাহা না হইলেই বা গন্ধের উপলব্ধি কি-প্রকারে সম্ভবপর হইত? যেই ধূপ পুড়িয়া ছাই হইল, ফুল-ফল লতা-পাতা শুকাইল, সীমার শিকল ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি তাহার গন্ধও অনন্তের সহিত মিলাইয়া গেল। সুরের মধ্যেও সেই একই ক্রিয়া। অথণ্ড অনন্ত সঙ্গীত যদি নিজ-সত্ত্বাতেই অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে কি তাহার সন্ধান পাওয়া সহজ হইত! তাই সে আপনিই অসংখ্য ছন্দের শৃঙ্খলে আপনাকে বাঁধিয়া অশেষপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু প্রতিধূপে যেমন অনন্ত গন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়, প্রতি-ছন্দোবদ্ধ সুরে বা রাগিণীতেও তেমনি সেই অনন্ত সুরের আভাস পাওয়া যায়।

রাগ-রাগিণীমাত্রই বিভিন্ন ভাবের অভি-ব্যক্তি। ভাবও অনন্ত বস্তু; নানাপ্রকার রূপ-পরিগ্রহতেই তাহার বিকাশ ও পরিণতি। ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া এমন একটু কিছুর ছাপ তাহাতে দিতে হইবে, যাহাতে দিব্য ও অনন্তের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। তাই কবি বলিয়াছেন,

"The light that never was on sea or land
The consecration and the poet's dream."

হিন্দু সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী এই অনন্ত ভাব-রাশির রূপবিকাশ। এই রূপ-বিকাশে শিল্প-কলার সুনিপুণ নিয়োগ চাই, কেন না রাগ-রাগিণীকে এক অর্থে Artistic বা Aesthetic Idealisation বলিতে পারা যায়। কাব্যে যেরূপ ভাষা ভাবের অনুগামিনী, সঙ্গীতেও সেইরূপ রাগাদি ভাবরূপের সহচর। ভাব যেখানে তরল, ভাষা ও সুরও সেখানে তরল; ভাব যেখানে গম্ভীর, ভাষা ও সুরও সেখানে গম্ভীর। তাই ভবভূতি যখন বলিলেন, মহৎ ব্যক্তির চরিত্র সহজে বোধগম্য হয় না, কখনও উহা বজ্রের ন্যায় কঠোর কখনও বা কুসুমের ন্যায় কোমল, তখন ভাষাটিও সেই-রূপই করিলেন; যথা, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" ইত্যাদি। সঙ্গীতেও সেই-রূপ তরল ভাব প্রকাশের জন্য ঠুংরি টপ্পা গানের সৃষ্টি; গুরু গম্ভীর ভাব প্রকাশের জন্য ধ্রুপদ ইত্যাদি গানের সৃষ্টি।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র।

পরশে।

তুমি নাথ, এসেছিলে
প্রথম প্রভাত গগনে;
তুমি নাথ, এসেছিলে
প্রখর দুপুর-তপনে!
তুমি এসেছিলে সখা
সাঁঝের সমীরে
ছড়ায়ে কুসুম-গন্ধ!
ফিরিয়া তোমারে, ওগো,
চাহি নাই আমি,—
ছিনু মোহ-ঘোরে অন্ধ!
মোর গর্ব্বিত মন
চাহে নি তোমায়,
দিয়াছে হেলায় ফিরায়ে;
শতবাহু মেলি

রয়েছ গো তুমি
বাঁধনে আমারে জড়ায়ে!
হৃদয় আমার
রুদ্ধ রয়েছে,
জ্ঞানের নাহিক লেশ!

তব, কোমল পরশে
জাগাও তাহে,
ঘুচে যাক্ সব ক্লেশ!

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

আমাদের খাদ্য।

আমরা কি আহার করি এবং কেন আহার করি সে-বিষয় ভাবিবার কিংবা জানিবার অবসর আমাদের প্রায়ই হয় না। সাধারণতঃ ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই আহারের প্রয়োজন হয় এবং আহারের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করি, ইহাই আমাদের ধারণা। উদর-সর্ব্বস্বদের মতে রসনা-তৃপ্তিকর নানাবিধ আহার্য্য আস্বাদনের জন্যই আমাদের জন্ম; কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মতে জীবনধারণের জন্যই আহারের প্রয়োজন। আমরা আহার করিবার জন্যই জীবন ধারণ করি, অথবা জীবন-ধারণের জন্য আহার করি,—এই সমস্যার মীমাংসা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হওয়া সুকঠিন।

আমরা কি আহার করি, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কেন আহার করি সে-বিষয় জানা আবশ্যক। আহারই শরীরের রক্ষা ও পুষ্টি-সাধনের একমাত্র উপায়, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহা কি প্রকারে সাধিত হয়? শরীরের পুষ্টি-সাধন দুইভাবে হয়।—

প্রথম, শরীরের বৃদ্ধি ও তাহার ক্ষয়-পূরণের জন্য দৈহিক-যন্ত্র-গঠন-উপাদান-সমূহের পুষ্টি-সাধন (Tissue Bulding).

দ্বিতীয়তঃ, শরীর-যন্ত্র-চালনের জন্য (এঞ্জিনের কয়লার ন্যায়) শক্তিসঞ্চয় প্রয়োজন।

আমরা যাহা কিছু আহার করি, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য উপরি উক্ত দুইটী কার্য্যের সহায়তা করা। যদিও প্রত্যক্ষভাবে আমরা উপরি উক্ত উদ্দেশ্যে আহার করি না, কিন্তু পরোক্ষভাবে আহারের দ্বারা উপরি উক্ত উদ্দেশ্যগুলিই সাধিত হইয়া থাকে। ইহার একটী উদাহরণ এই যে, যখন আমরা সুস্থ-শরীরে থাকি, তখন যাহা অভিরুচি তাহাই আহার করি, কিন্তু শরীর অসুস্থ হইলেই চিকিৎসকের নিকট আহারের ব্যবস্থা লইতে হয়; অর্থাৎ তখন কোন্ যন্ত্রের পুষ্টির জন্য কিরূপ আহারের প্রয়োজন, তাহার নির্ণয় বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অন্যের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। উদর-সর্ব্বস্বেরা এই সময়েই আপনাদের ভুল বুঝিতে সমর্থ হন। বৈজ্ঞানিকেরা আহার ও আহার্য্য-সম্বন্ধে অনেক বহুমূল্য উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের উপদেশ-মত চলিলে কায়িক ও আর্থিক অনেক স্বচ্ছলতা হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহা করি না। যখন অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য বস্তু পাওয়া যায়, তখন মিতব্যয়িতার কথা মনে থাকে না। তখন আমরা আহার্য্য বস্তুর